roopbaan

রূপবান

জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ । বর্ষ ১ । সংখ্যা ২

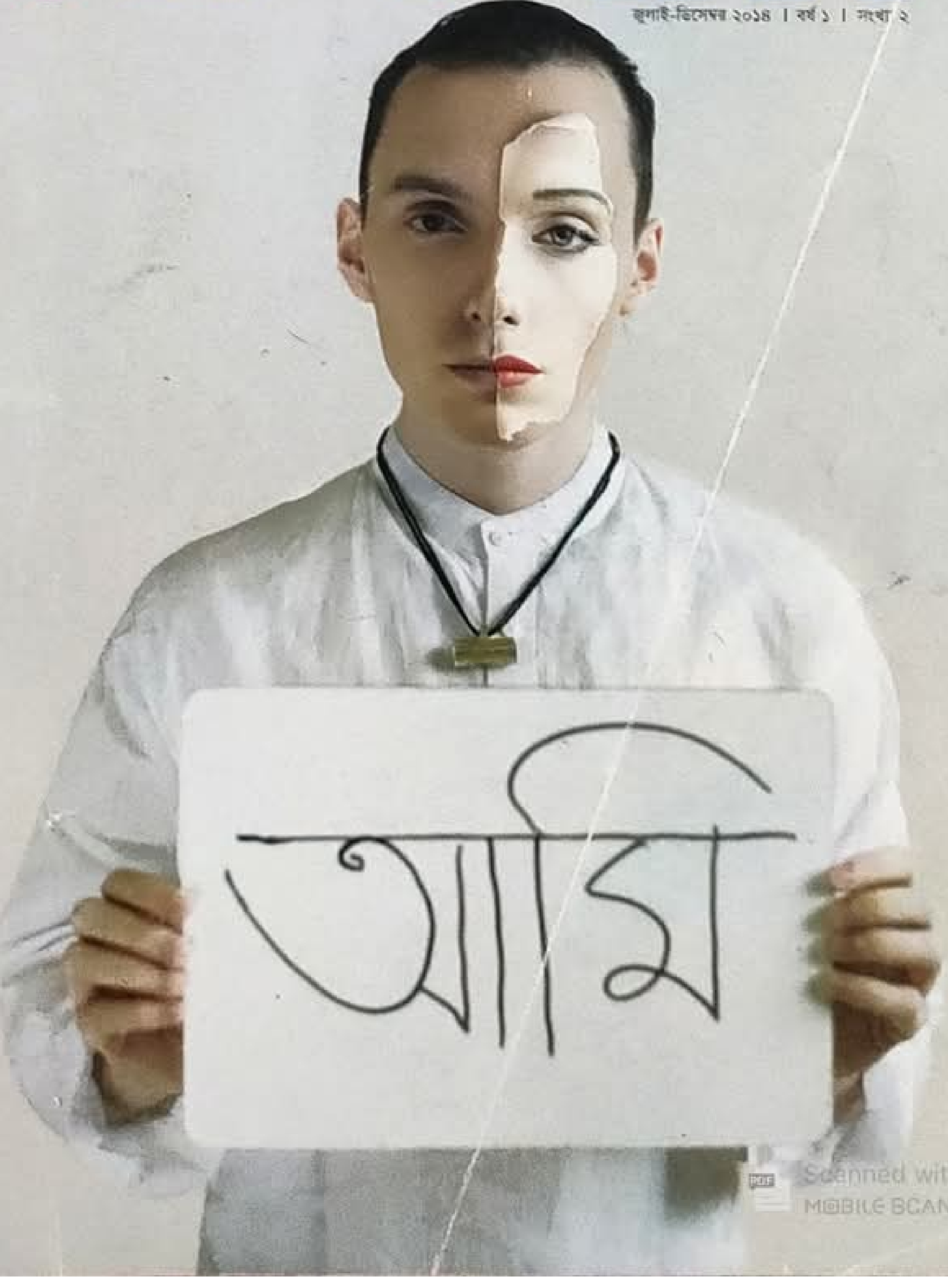

Scanned with MOBILE SCANNER

women of modigliani
pen on paper, 27x13cm, (each) 2014

Mahdi
Artist & Graphic Designer
For collection, please contact
mahdi4artdesign@gmail.com

Scanned with
MOBILE SCANNER

IDAHOT

আমার
ভালোবাসা
তোমাকে
আঘাত
করে
না

কিন্তু
তোমার
ঘৃণা
আমাকে
আঘাত
করে

May 17, 2014
International Day Against
Homophobia & Transphobia
(IDAHOT)

সূচী

রূপবান | roopbaan | বর্ষ ১ | সংখ্যা ২ | জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪

6
প্রচ্ছদ

9 উপপাঠ আত্মহত্যা
জীবনের সমার্থক তো কেবল জীবনই

13 মূলপাঠ চাটগাঁয়ের অন্দরে
চট্টগ্রামের অন্দরমহলে কেমন আছেনে সমপ্রেমীরা

17 কবিতা ভৃত্য, প্রভুকে!
আসলে প্রেম একটা রোগ, একটা ঘুণপোকা

18 গল্প জুলাইয়ের তিন
গণিতের শিক্ষক নাকি প্রিয়তম ভালোবাসা

22 উপপাঠ নারী পাঠ
এই দেশে মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়েকে ভালোবাসা যায় কি

24 উপপাঠ আমার চোখে বাংলাদেশ
একজন সমপ্রেমী মেয়ের চোখে বাংলাদেশ

25 গল্প অনাবৃত
আদর আর আশঙ্কার গল্প

26 সাক্ষাৎকার উন্মেষে অভিজিৎ রায়
অভিজিৎ রায় রূপবানের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন সমকামিতা নিয়ে তার লেখা বইয়ের অভিজ্ঞতার কথা

30 খ্যাতিমান যাঁরা সান্নিধ্যে শয়ন
মৃত্যুর পরেও পাশাপাশি শয়ন

36 উপপাঠ প্রকৃতভাব
সূর্য কি নারী না পুরুষ; চাঁদ আমাদের মামা না প্রেয়সী; পাথর দেবতা নাকি দেবী; আগুন আমার ভাই না বোন

38 ভ্রমণ গাঁথা বান্দরবনের গহীনে
থানচি, তিন্দু, রেমাক্রি থেকে নাফাকুমের পথে

42 আদর্শলিপি আ-তে আদর
শরীর কতটা আদর চায় আর কতটুকু নিতে পারে

56 সাক্ষাৎকার আমাদের চোখে সমপ্রেম
বিবাহিত দম্পতি কথা বললেন তাদের দেখা অন্য এক সমপ্রেমী যুগল নিয়ে

60 স্বাস্থ্য কথন জাগরীতে একদিন
কি হয় জাগরীতে? জানতে চাইলে পড়ুন

62 ফ্যাশন গরমে নরম
এই গরমে ছেলেদের পোষাকী ব্যাকরণের ভাষা

65 জীবন যাত্রা টাওয়েলের সুস্বাস্থ্য
গোসলের টাওয়ালের স্বাস্থ্য কথন

66 রসনা সবজি বিরিয়ানির প্রেম
খাবার টেবিলে প্রেমের রসায়ন

68 ফিল্ম রিভিউ
পাঁচটি আলাদা সিনেমা, কিন্তু কোথায় যেন এক সুতোয় গাঁথা

Scanned with
MOBILE SCANNER

70 রূপবান সংবাদ
গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী

72 বই সমাচার
দি এক্সাইল এবং নীল যমুনার জলে

73 বিনোদিনী চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ
চলচ্চিত্র এবং মঞ্চপাড়ার খবর

74 আমাদের কথা ভার্চুয়াল বনাম সর্বনাম
প্রাপ্তি বনাম অপ্রাপ্তির গল্প

76 রঙিলা নীল
প্রাচীন মিশরীয় ঈশ্বর আমুন তার গায়ে নীল রঙ মেখে আকাশে উড়াল দিয়েছিল

77 আমাদের কথা অনু-কাব্য
জীবনের মাঝবেলায় দাঁড়িয়ে সব অতৃপ্তি, যন্ত্রণা, আর নিঃসঙ্গতাকে মেনে নিয়েই আমার তৃপ্তি

78 ঘরে-বাইরে
গত কয়েক মাসের নানা অনুষ্ঠানের চিত্রসম্ভার

80 রাশি রূপ টরাস
কোষ্ঠীনুযায়ী বৃষ রাশির জাতক হবেন শুভ্রবর্ণ, মাংশল ভরাট স্কন্ধ, পুরু ওষ্ঠ, সুন্দর চক্ষুদ্বয় এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশধারী

আমি

44 আমি বিয়ে করতে চাই না
বিয়ে আমার জন্য ভয়ঙ্কর দুর্বোধ্য একটা জিনিস, আমি বিয়ে করতে চাই না

46 আমার কাপড়ে আমি
সাধারণের ফ্যাশন ভাবনা!

48 টার্ন অফ
মুখে গন্ধ, নোংরা কাপড় নাকি বাজে উচ্চারণ! শুনুন আমার টার্ন-অফের গল্প!

50 পঞ্চাশের পর আমি
কেমন আছি আমি, পঞ্চাশের পর?

51 স্থূল আমি
আমি মোটা! সেটা কি কেবলই আমার অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের ফল?

52 কনডম কনডম
ঢাকার রাস্তায় একটুকরো বৈধ জিনিস নিয়ে চলা কতটা অবৈধ হতে পারে! শুনুন আমার অভিজ্ঞতা!

53 প্রথম চুমু
আমার প্রথম চুমুর শিহরণের গল্প

54 আর ইউ ডিসক্রিট
আমার নিত্যদিনের অভিনয়

55 তোমার প্রকাশ হোক
যেদিন প্রথম প্রাণের বন্ধুটিকে আমার সেই গোপন কথাটি জানালাম

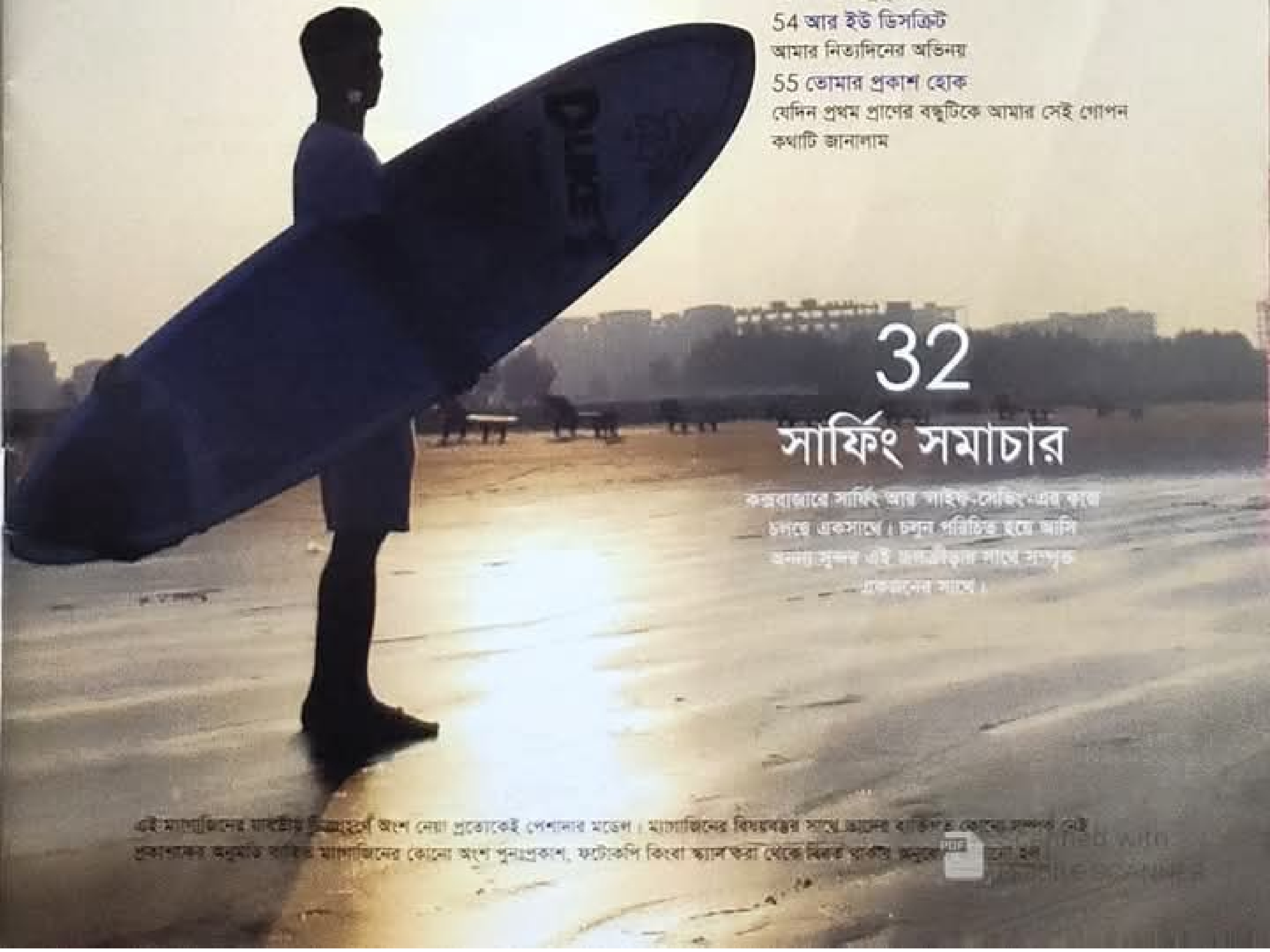

32
সার্ফিং সমাচার
কক্সবাজারে সার্ফিং আর লাইফ-সেভিং-এর কাজ চলছে একসাথে। চলুন পরিচিত হয়ে আসি অনন্য সুন্দর এই জলক্রীড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট একজনের সাথে।

এই ম্যাগাজিনের যাবতীয় চিত্রগ্রহণে অংশ নেয়া প্রত্যেকেই পেশাদার মডেল। ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তুর সাথে তাদের ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নেই।
প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত ম্যাগাজিনের কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, ফটোকপি কিংবা স্ক্যান করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হল

www.valentinasyed.co.uk

VALENTINA SYED

Make-up artist based in London
www.valentinasyed.co.uk
Instagram: valentinasyedmua
Twitter: @valentinasyed

A London based makeup artist, Valentina has been working in the industry for over five years.

Whilst having completed Biomedical Science at university, and qualifying as a Science teacher, Valentina's passion has always remained in the art of makeup.

Valentina is versatile and unique; her main expertise is beauty, editorial and avant-garde make-up, but her services also include bridal and glamour.

Valentina's established client base includes RUSH hair and Liquorish clothing found on ASOS. Her publications include V&Oak magazine available in Harrods and Selfridges in London. And her most recent magazine collaboration was with Roopbaan, which was an honour for her to be involved with as a Bengali and part of the LGBT community.

In future Valentina is working on producing inspirational and meaningful projects in collaboration with talented creatives.

Scanned with
MOBILE SCANNER

সম্পাদকীয়

আমাদের আরও আগে আসার কথা ছিল, দেরিটা একেবারেই অনৈচ্ছিক এবং অপ্রত্যাশিত। কিছু অনভিপ্রেত সমস্যার কারণে সমস্ত কাজ হয়ে যাবার পরেও হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় ছিল না। তবে আশার কথা হলো আমরা আবার হাজির হতে পেরেছি এবং তাও নতুন রঙে। রূপবান এবার নীল, তবে বেদনার নীল নয়! স্নিগ্ধতা, মঙ্গল, বন্ধুত্ব এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে এই রঙে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা।

রূপবানের এবারের সংখ্যার মূল-ভাব: আমি-একেকজন আমি মিলেই আমরা। পুরো সংখ্যাজুড়েই আমাদের একেকজন আমি-এর নানান ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সামনে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যা-কিনা দিনশেষে সামগ্রিকভাবে আমাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা দেখাতে চেয়েছি যৌন সংবেদনশীলতা কিংবা সামাজিক চাপের মধ্যে বাস করা একেকজন আমি-এর গল্প কিভাবে ভোল পালটে আমাদের সকলের গল্পে রূপান্তরিত হয়।

মূল প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে চিত্রের সাহায্যে নারী কিংবা পুরুষ হিসেবে আমাদের যে পোশাকি উপস্থাপনা, সেটাকে আমরা প্রশ্ন করতে চেষ্টা করেছি। কেবল কয়েক প্রস্থ কাপড় আর বাহ্যিক প্রসাধনী আমার ভেতরের আমিকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রধান নির্ণায়ক হতে পারে না। পোশাক, গায়ের রঙ কিংবা ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে সবার প্রথমে মানুষ হিসেবে আমাদের যে পরিচয়, সেটাকেই প্রাধান্য দিয়ে আমাদের এবারের প্রচ্ছদের কাজ করেছি আমরা।

ম্যাগাজিনে গতবারের চেয়ে এবার স্থিরচিত্রের কিছুটা প্রাধান্য থাকছে। বিষয়বস্তুর মনোনয়ন নিয়ে গতবার অনেকেই আপত্তি তুলেছেন, সেই আপত্তি আমরা মাথায় রেখেছি। তবে রূপবানকে আমরা কেবল আমাদের দুঃখ আর হতাশার প্রামাণ্য দলিল বানাতে চাইনি, যে কারণে কেবল গল্পের চাইতে বিষয়ভিত্তিক লেখাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দিনশেষে কেবল অধিকারের কথা না বলে আমরা যে আর দশজনের চেয়ে আলাদা কিছু নই, সেটা তুলে ধরতেও আমরা সচেষ্ট ছিলাম।

আমরা ভালোবাসার শ্লোগান তুলে যাত্রা শুরু করেছিলাম, এ সংখ্যাতেও তা অব্যাহত থাকবে। এবারের সংখ্যায় গতবারের চাইতে আরও অধিক সংখ্যক মানুষের সাগ্রহে অংশগ্রহণ আমাদের মনোবল আরো চাঙ্গা করে তুলছে। শুধু কিছু কাগজে লেখা আর ছবি নয়, রূপবান হয়ে উঠুক আমাদের একে অন্যের কাছে আসার মাধ্যম।

প্রকাশক
মুমন
সম্পাদক
রাসেল

লোগো
হৃদয়
ডিজাইন
মাহদী
বিশেষ সহযোগী
অনয়

বিপনন
মিশা
আলোকচিত্রী
মুমন
Arnaud Gastaut
জুয়েল
ইলাস্ট্রেশন
Valérie Jadot
মাহদী
আলীম

প্রদায়ক
প্রদীপ
জাকির
নাজিয়া
ফারহাত
আনন্দধারা
অনয়
শাওন
রাকিব
মিশা
জ্যোতি
রেহেল
শুভ্র
তৌহিদুর
কায়া
আলীম
রাজীব
শাতিল
অভিজিৎ
মিনার
পপলি
শার্দুল
পাভেল
রাসেল

প্রচ্ছদ
স্টাইলিস্ট
Andrea N Choco (Negoita)
মেকআপ আর্টিস্ট
Valentina Syed
মডেল
Michal Szpak
ফটোগ্রাফার
Anna Radchenko

Scanned with MOBILE SCANNER

আমি

প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসলটা সেরে আপনি গিয়ে দাঁড়ান আপনার কাপড়ের আলমারিটার সামনে, সারাদিনের অভিনয় প্রস্তুতির অংশ হিসেবে হাত বাড়ান আপনার কাপড়গুলোর দিকে। এতোদিন পর্যন্ত ভেবে এসেছেন আপনার পোষাক কেবলমাত্র আপনার রুচি, আভিজাত্য কিংবা সৌন্দর্য্য দূত হয়ে অন্যের সামনে আপনাকে তুলে ধরে। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন কি, আপনার সেই পোষাক সারাটা জীবন আপনার 'জেন্ডার পারফরমেন্সে'র প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে আপনাকে অন্যের সামনে কিভাবে উপস্থাপন করছে? আপনার পোশাকটির ঝুল, দৈর্ঘ্য-প্রস্থের গড়ন, কাপড়ের রঙ থেকে শুরু করে জুতোর উচ্চতা, মেক-আপ কিংবা হাতে নিয়ে চলা ব্যাগটি পর্যন্ত, এসবকিছুই অন্যের সামনে আপনার লৈঙ্গিক পরিচয়ের প্রকাশ ঘটায়। আপনি কিভাবে কথা বলছেন, হাতটি নাড়াচ্ছেন, হাসছেন কিংবা কারো দিকে তাকাচ্ছেন, এর পুরোটাই নির্ধারিত হতে পারে আপনার বাহ্যিক পোষাক আপনাকে কোন লিঙ্গ হিসেবে অন্যের সামনে তুলে ধরছে সেটার দ্বারা।

আপনি নারী কি পুরুষ, তার নির্ণায়ক কেবল আপনার যৌনাঙ্গ নয়, সারাজীবন ধরেই।

MOBILE SCANNER

যৌনাঙ্গের অনুচর হয়ে উপযুক্ত নারী কিংবা পুরুষ চরিত্রে আপনাকে রূপদান করে যেতে হয়। এর থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলেই আপনার দিকে সমাজ আঙুল তুলবে, হাসবে, মজা করবে। আপনার আজন্ম অংশ নেয়া এই 'জেন্ডার পারফরমেন্সে' আপনার ভিতরকার আমি'র অংশগ্রহণ নাও থাকতে পারে। ঠিক মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তটিতে যেমন কেউ কাপড় পরে বেরোয় না, ঠিক তেমনিভাবে একজন উপযুক্ত নারী কিংবা পুরুষ হিসেবে তাদের আচরণের ধারাগুলোও মাথায় থাকে না। আমার আমি কি রঙ পরবে, খাবে কিংবা কোন পোষাকে বাইরে যাবে, তার যতোটা ভিতর থেকে আসে, বাটলার থিওরি অনুযায়ী সেই মানসিকতা তৈরিতে সিংহভাগ ভূমিকা রাখে আমাদের সমাজ, আশেপাশের প্রচলিত নিয়ম-নীতি। পোষাকী বাহ্যিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষটি কি আসলেই কেবল তার লিঙ্গ দ্বারা পরিচালিত হন? পোষাকের পর পোষাক বদলে গেলেই কি আসলেই তার ভিতরে থাকা মানুষটিও বদলে যায়? মুখের কিছু অতিরিক্ত রঙ আর সাজসজ্জার ভিন্নতার আড়ালে আমি তো কেবল আমি-ই। দেশ, কাল, ভাষা, গায়ের রঙ কিংবা পোষাকী ভিন্নতা ছাপিয়ে আমি কেবল আমার নিজস্ব আমি-তেই! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

Scanned with
CAMSCANNER

Stylist
Andrea N Choco (Negoita)

Make-up Artist
Valentina Syed
www.valentinasyed.co.uk

Model
Michal Szpak

Photographer
Anna Radchenko
www.annaradchenko.com

This whole photo shoot was done exclusively for Roopbaan by Valentina Syed and her team. Ms. Syed is a Bangladeshi origin London based make-up artist.

Scanned with MOBILE SCANNER

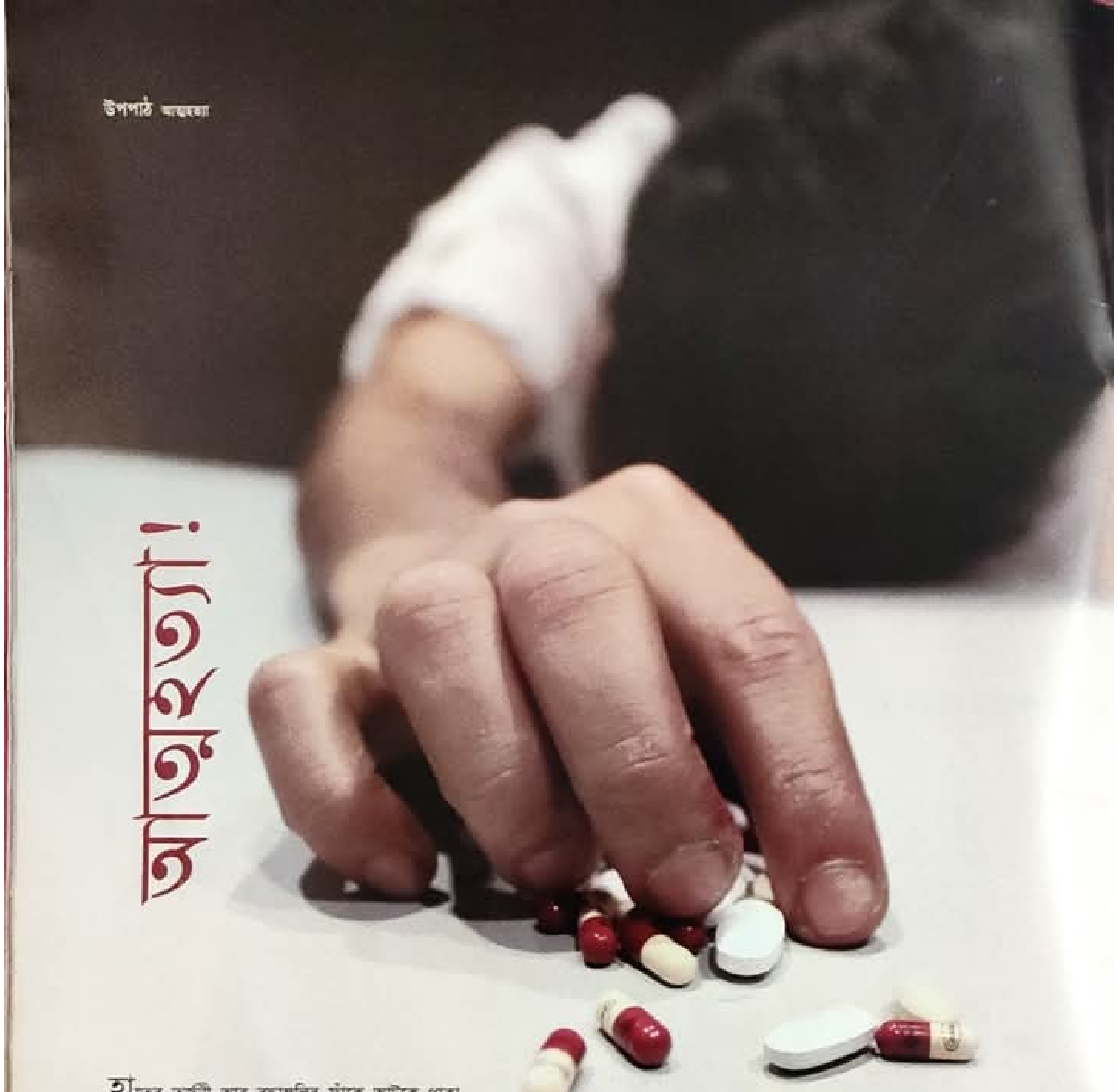

আত্মহত্যা!

হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির ফাঁকে আটকে থাকা দুধে-আলতা সাদা গোল বড়িটার দিকে প্রত্যয় (ছদ্মনাম) সম্মোহকের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। শেষ অবধি খাবে কি খাবে না তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে মাথায়। সন্ধ্যায় দাঁতের প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ডেন্টিস্টের কাছে যাবার পর এই ঘুমের ঔষুধটাও ডাক্তার 'প্রেস্ক্রাইব' করে দিয়েছে অন্যান্য ঔষুধের সাথে। নিতান্ত অনিচ্ছাভরে ঔষুধটা খাবার আধ ঘন্টার মধ্যে ঝাঁঝালো টক ঢেঁকুর ওঠা শুরু করল। এই টক ঢেঁকুর প্রত্যয়কে মুহূর্তেই বছর দেড়েক আগের পুরোনো ঢাকার কয়েক শ স্কয়ার ফিটের বন্ধ ঘরটায় নিয়ে গেল। রাতের শেষ করা পুরো এক প্যাকেট সিগারেটের ধোঁয়া তখনো এখানে সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেড়াচ্ছে, দরজা-জানালা সব বন্ধ থাকায় কোথাও বেরোবার সুযোগ পায়নি। দরজায় দমাদম কিলের শব্দগুলো মৃদু থেকে মৃদুতর লয়ে কানে ঢুকছিল। মাথার কাছে অবিরাম ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে বেজে চলা মোবাইল ফোনের কম্পনটাও কিছুক্ষণের জন্য টের পাচ্ছিল প্রত্যয়। গলার মধ্যে ঝাঁঝালো একটা টকে যাওয়া স্বাদ। তারপর সবকিছু আবার সাদাটে শূন্যতায়

ভরে গেল। ওর রক্তে পঁচাত্তর মিলিগ্রামের ঘুমের বড়িগুলো ততোক্ষণে প্রগাঢ় তন্দ্রার জাল বুনে ফেলেছে। মিস্ত্রী ডাকিয়ে দরজা ভেঙে যখন প্রত্যয়ের পরিবার ঘরের মধ্যে ঢুকছে, সেই আতঙ্কিত মুখগুলো ওর আর দেখবার ক্ষমতা ছিল না।

১৬৫১ সালে ওয়াল্টার চার্লেটিন নামক এক ইংরেজ 'ফিজিশিয়ান' সর্বপ্রথম ইংরেজিতে 'সুইসাইড' শব্দটি ব্যবহার করেন। বাংলায় আমরা বলি আত্মহত্যা। অভিধানিক অর্থে নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে হত্যাকে বলা হয় আত্মহত্যা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাকে ধর্মীয়ভাবে পাপ, আইনগতভাবে অপরাধ কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রে মানসিক ব্যাধি বলে চালাবার চেষ্টা করেও লাগাম টেনে ধরা যায়নি। পৃথিবীতে একবার মাত্র জন্ম নেবার এই দুর্লভ সুযোগকে নিজ হাতে যারা শেষ করে দিতে চায়, তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আজ অবধি কম বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়নি। পৃথিবীব্যাপী আত্মহত্যার বিভিন্ন 'কেস স্টাডি' ঘেটে তিনটি বড় কারণ সনাক্ত করা গেছে: অসহনীয় শারীরিক পীড়া, সামাজিক অবমূল্যায়ন এবং হতাশা/সন্দেহ।

সামগ্রিকভাবেই আত্মহত্যা ব্যাপারটা উদ্বেগের বিষয় হলেও সমগ্র বিশ্বব্যাপী চালানো বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সমপ্রেমী/এলজিবিটি কমিউনিটির মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা ২ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত বেশি। পুরো বিশ্বে ২০-৩৫ শতাংশ সমপ্রেমী যেখানে একবার করে হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন সেখানে এই প্রবৃত্তির প্রায় অর্ধেক জীবনে কখনো না কখনো আত্মহননের কথা ভেবেছেন। আমরা যদি গত শতকের পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের দিকে তাকাই, খোদ আমেরিকার সংবাদপত্রে অসংখ্য পুরুষের আত্মহত্যার গল্প পেয়ে যাব যাদেরকে 'মোরাল চার্জে' পুলিশ ধরেছিল। যৌন বিকৃতি হিসেবে স্বীকৃত তখনকার আমেরিকাতে এ ধরনের পুলিশি গ্রেফতারের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার ফলে অপমান, গ্লানি কিংবা সামাজিকভাবে অপদস্থ হবার ভয়ে অনেকেই আত্মহত্যাকে শেষ অবলম্বন হিসেবে বেছে নিতেন।

আমেরিকাসহ ইউরোপের অনেক দেশেই এখন অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে। কিন্তু আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত একটি দেশে এখনো বাস্তবতা অনেকটা সেই একশো বছর আগেকার ইউরোপ-আমেরিকার মতোই রয়ে গেছে। প্রায় একশো বছর আগে ইউরোপের অনেক নামকরা দেশেই সমপ্রেমীদের জনসম্মুখে অপদস্থ করা, জেলে পোরা কিংবা পিটিয়ে বা পুড়িয়ে মারবার মতো চূড়ান্ত ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশে এখনো বিষয়টি তেমনভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় সামনের দিনগুলো কেমন হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু ভয়ের জায়গাগুলো রয়েই গেছে। সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত কিংবা অপদস্থ হবার ভয়, পারিবারিকভাবে সম্পর্কচ্যুত হবার ভয়, বন্ধুদের হারানোর ভয় থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে সম্মান হারানোর ভয়টা যেন সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের তটস্থ করে রাখে।

কোনো একটি সম্পর্ক, একটি পরাজয় বা একটি যন্ত্রণা জীবনের অগণ্য সৌন্দর্য্যপ্রভার চেয়ে বড় নয়। চোখ মেলে একবার চারপাশে চাইলেই বুঝতে পারবেন জীবনের কত সৌন্দর্য্য এখনো দেখা বাকি, কতকিছু করা বাকি, জীবনকে এখনো বলা বাকি যে সে কতটা সুন্দর!

জন্মগতভাবেই আমরা দেখে আসছি, সাধারণত সমাজ ভিন্ন কিছু গ্রহণে অভ্যস্থ নয় সেটা যতোই নিরপরাধ কোনো ব্যাপার হোক না কেন। জন্ম কিংবা মৃত্যু নিবন্ধন সনদে তাই কার লিঙ্গ কি সেটা বেছে নেবার সুযোগ দেয়া থাকলেও কার যৌন প্রবৃত্তি কি সেটা বলবার কোনো সুযোগ নেই। আর যৌন প্রবৃত্তি মানে যে কেবল শারীরিক কোনো ব্যাপার নয়, এর সাথে মানসিক বা আবেগীয় সত্ত্বাও জড়িত থাকে, সেটা বুঝবে কয়জন? এই সমস্ত ছাইপাশ চিন্তার বোঝা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে বাস করা যেকোনো ভিন্ন প্রবৃত্তির মানুষকে ক্লান্ত করে রাখে।

আমার যা অপছন্দ, আমাকে অনেক সময় সেই চরিত্রেই অভিনয় করে যেতে হচ্ছে। মা-বাবা থেকে শুরু করে সবচেয়ে কাছের বন্ধুটির কাছেও নিজেকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে রাখার অদম্য যুদ্ধ। 'পাছে ধরা পড়ে যাই'—এই নিরন্তর চাপা ভয় আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মিথ্যাবাদী বানিয়ে চলছে। চারপাশের চলা স্বাভাবিকতা আর বিকৃতির প্রচলিত সংজ্ঞার সাথে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে তাল হারিয়ে তৈরি হচ্ছে 'ইন্টারনাল হোমোফোবিয়া'। নিজেকে নিজের কাছেই লুকোতে লুকোতে এক সময় সমলিঙ্গের প্রতি নিজের পছন্দ, আবেগ বা ভালোবাসাকে নিজের কাছেই বিকৃত মনে হতে শুরু করে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় মানসিক অবদমন। নিজের পরিবার বা প্রিয় বন্ধুর মতো নিতান্ত প্রিয়জনদের কাছে নিজেকে দমিয়ে রাখার তাৎক্ষণিক কোনো বিরূপ ফলাফল দেখা না গেলেও সামগ্রিকভাবে এর মানসিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই অবদমনকে সমপ্রেমী সমাজের আত্মহত্যা প্রবণতার অন্যতম মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা আধ সংজ্ঞাহীন প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। মিডফোর্ড হাসপাতালে স্ট্রেচারে করে তার ছোট ভাই তখন দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে তাকে নিয়ে ছুটছেন। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার পর প্রথমেই থানায় জিডি করবার জন্য বলা হয়। জিডি শেষ করে খুব দ্রুত তাকে ওয়াশ করাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চার পাতা ঘুমের ঔষুধ পেটে থাকার পরেও প্রত্যয়ের মতে ওয়াশ করাবার মতো দুঃসহ বিভীষিকা তিনি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। পুরো তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকার পরেও ঐ কয়েক মিনিটের স্মৃতি তার কাছে এখনো স্পষ্ট। 'আমি টের পাচ্ছিলাম আমার হাত-পা কিছু দিয়ে বাঁধা হচ্ছে। মুখের মধ্যে এরপর একটা ব্রেড আটকিয়ে দিল। এরপর একটা এক ফুটের মতো লম্বা পাইপ মুখের ভিতর দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল! মুখের ভিতর এক ইঞ্চি একটা আঙুল ঢুকালেই কেমন লাগে আর সেই বীভৎস যন্ত্রণার তো কোনো জুড়ি নেই', বলছিলেন প্রত্যয়। কিভাবে শরীর থেকে ঔষুধ বের করা হয় তার পুরো বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, 'পাইপ দিয়ে পানি ঢালতে থাকে, প্রায় ৫০০ মিলির মতো পানি পেটে পড়লে পাকস্থলী আসলে ভরে যায়, তখন আর শ্বাস নেয়া যায়

Scanned with MOBILE SCANNER

কাছেই নিজের যৌন অভিব্যক্তির পর্যাপ্ত গোপনীয়তা একেবারে ষষ্ঠতম মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। স্কুল, কলেজ, পাড়া, মহল্লা কিংবা পারিবারিকভাবে পরিচিত মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশের অন্যান্য যেকোনো শহরের চেয়ে চট্টগ্রামে বেশি হবার কারণে সবার মনের মধ্যেই 'কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে' শঙ্কা কাজ করতে থাকে। পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে সমপ্রেম অগ্রহণযোগ্য হবার কারণে সকলের মনের মধ্যেই নিষিদ্ধ কিছু করবার অনুভূতি প্রবলভাবে বিরাজমান। একবাক্যে তাই সকলেই বললেন, 'সবার কাছে যা অগ্রহণযোগ্য, সেটাকে দিনের আলোয় আনার কোনো মানেই নেই।' নিজের মানসিক কিংবা যৌন প্রবৃত্তির এই অংশটুকুকে তাই কমবেশি সকলেই যতোটা সম্ভব লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করে। সামাজিকভাবে প্রচণ্ড অগ্রহণযোগ্য এবং অপ্রকৃতস্থ আচরণ হিসেবে চিহ্নিত হবার কারণে নিজের পরিচয়ের এই অংশটুকু অনেকেই সহজভাবে নিতে পারে না। আত্মস্বীকৃতিজনিত দুর্বলতার কারণে বেশিরভাগ রূপবানই আর দশটা অপরাধের মতন নিজের ভালো লাগাকেও প্রাণপণে লুকনোর চেষ্টা করে। তবে আসলেই কেউ কোনোদিন ধরা পড়েছে নাকি চিলে কান নিয়ে যাবার ভয়ে এই 'হাইড এন্ড সিকে'র দুষ্টচক্রে সবাই বন্দী এমন প্রশ্নের জবাবে শাফি বললেন, 'কিছু একটা নিয়ে সবাই ভীত, কিন্তু আসলে কি নিয়ে ভীত তা কেউ জানে না।' নিজের প্রবৃত্তি নিয়ে প্রচণ্ড মাত্রায় অস্বস্তি এই ধরা পড়ে যাবার ভীতি তৈরি করে বলে মনে করেন বেশ কয়েকজন।

যেভাবে কাছে আসা!

এর জবাবটা বেশ সহজ, সমগ্র পৃথিবীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চট্টগ্রাম শহরেও বর্তমানে সমমনাদের খুঁজে পাবার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হলো 'ইন্টারনেট'। অনলাইনে বসে কয়েক ক্লিকেই নিজের পছন্দমতো সঙ্গী খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নিজের পরিচয় নিয়ে অস্বস্তিবোধের কারণে জানা গেল অনেকেই তাদের পরিচয়ের পাতকড়ি কেবল ভার্চুয়াল জগতেই সীমাবদ্ধ রাখেন, অনলাইনে কথা বলতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, এর বাইরে কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে চান না। ফেসবুক, ম্যাঞ্জাম কিংবা হালের গ্রাইন্ডারের মত সফটওয়্যারগুলোর কল্যাণে ভার্চুয়ালি নিজেদের সুবিধাজনক পরিচয় তৈরি এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। পরিচিত কারো কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে নিজের নাম, ঠিকানা থেকে শুরু করে বয়স পর্যন্ত 'কাস্টমাইজ' হচ্ছে অহরহ। অদৃশ্য সমাজের চাপিয়ে দেয়া ব্যাধির বোঝায় সকলেই সন্ত্রস্ত। তবে যাদের অনলাইনে বসার সুযোগ হচ্ছে না তারা কি করে? এ ক্ষেত্রে অনেকেই একে অন্যের পরিচিত মানুষের 'রেফারেন্সে' কথা বলে। আর যাদের তেমনটি করবার মতো 'নেটওয়ার্ক'ও নেই, তাদের জন্য ঢাকার মতো চট্টগ্রামও কিছু স্থান বরাদ্দ করে দিয়েছে। কোথায় কোথায় এমন সামনাসামনি খুঁজে নেবার কর্ম চলে জানতে চাইলে ঘুরে ফিরে সামনে চলে আসতে থাকে জিইসি মোড়, ডিসি হিল, দুই নাম্বার গেট (বিপ্লবী উদ্যান), লালদিঘী পার্কের মতো বেশ কিছু পরিচিত নাম। 'সন্ধ্যার পরে প্রথমে লালদিঘী যাই, ওটা সাতটার সময় বন্ধ হলে সেখান থেকে দুই নাম্বার গেট যেটা কিনা আটটায় বন্ধ হয়ে যায়, সেখান থেকে সোজা ডিসি হিলে চলে যাই যেটা প্রায় দশটা-এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে', জানাচ্ছিলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন। ঢাকার মতো চট্টগ্রামের এসব জায়গাতেও প্রেম, বন্ধুত্ব কিংবা আড্ডাবাজি সবকিছুই চলতে থাকে সমানতালে। ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন না যারা, সমমনা মানুষদের খুঁজে পেতে এসব জায়গাগুলোই তাদের শেষ ভরসা।

অঙ্গ নাকি সঙ্গ!

চমকে উঠলেন? রূপবান সব রসাতলে নিয়ে গেল ভাবছেন? বাস্তবতাকে অস্বীকার না করেই আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম চট্টগ্রামে দুইজন সমপ্রেমী যখন যোগাযোগ শুরু করে, বন্ধুত্ব, যৌনতা নাকি প্রেম, কোনটা প্রাধান্য পায়? আমাদের চমকে দিয়ে অনেকেই বললেন তাদের মাথায় অঙ্গের চেয়ে সঙ্গই বেশি প্রবল থাকে। তবে প্রেমের চাইতে বন্ধুত্বের সম্পর্কই তাদের কাছে বেশি উপভোগ্য। অন্যান্য বন্ধুর চেয়ে সমপ্রেমী বন্ধুদের ভিন্ন চোখে দেখেন কিনা প্রশ্নের জবাবে একজন বললেন, 'বন্ধু তো বন্ধুই! আমার অন্য বন্ধুদের আমার জীবনের একটা অংশ বলতে না পারলেও এখানে এসে সবটা নিশ্চিন্তে বলতে পারি, এক্ষেত্রে তারতম্য করার তো প্রশ্নই আসে না। আমার বাসাতেও আমার সমপ্রেমী বন্ধু, যারা অনেকদিনের পরিচিত,

তারা অহরহই আসছে।' শাফি জানালেন চার-পাঁচ বছর ধরে বন্ধুত্ব চলে আসছে এমন অনেকেই আছে। এমনকি চব্বিশ-পঁচিশজনের বড় গ্রুপও আছে যারা পয়লা বৈশাখে একসাথে ঘুরতে বেরোয়, কক্সবাজারে বেড়াতে যায়, নৌকায় ঘুরে সন্ধ্যা কাটায়। নিউমার্কেটের পাশের টঙের দোকানে যখন চায়ের কাপে আড্ডার ঝড় উঠে, তখন তাদের কার কি পরিচয়, কে কোন বয়সের কিংবা তাদের প্রবৃত্তি খড়কুটোর মতো ভেসে যায় খেলাধুলা, রাজনীতি কিংবা কেবল তাদের অফিসে কি হলো সেসব গল্পের তোড়ে। 'আমার জীবনে এমনকিছু ঘটতে পারে না যা আমি রাজনের সাথে বলতে পারি না', শাফি বলছিলেন তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটিকে নিয়ে। বন্ধুত্ব নিয়ে উচ্ছ্বাস যেকোনো চাটগাঁইয়ার মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করেন অনেকে।

ভালোবাসা ভালোবাসা

এবার তরী ভেড়াই ভালোবাসার তটে। প্রেম, ভালোবাসা কিংবা সম্পর্কের মতো আবেগী বিষয়গুলোকে চট্টগ্রামের রূপবানেরা কিভাবে মূল্যায়ন করেন। এক্ষেত্রে যারা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আছেন

Scanned with MOBILE SCANNER

তাদের ভাষ্য অনেকটাই স্পষ্ট, তারা তাদের ভালোবাসার অধিকারটুকু চান, শুধুমাত্র পুরুষ হয়ে আরেকজন পুরুষকে ভালোবাসার জন্য তারা মানসিক বিকারগ্রস্থতার দায়ভার নিতে চান না। আর দশটা সম্পর্কের শুরু থেকে শেষ অবধি টানাপড়েন, ভালোলাগা-মন্দলাগা ভাগ করে নেবার জন্য পাশে কাউকে না কাউকে পাওয়া গেলেও সমপ্রেমীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র সম্পর্ক চেপে যাবার ব্যাপারই থাকে না, ক্ষেত্র বিশেষে অন্যদের সামনে তাদের বিষমপ্রেমী সেজেও থাকতে হয়। এই সমস্ত রকম প্রতিকূলতা আর অস্বস্তি থেকে সৃষ্ট মানসিক চাপ যেকোনো সমপ্রেমী যুগলের সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব ফেলে। শাফি জানালেন দুটো ছেলের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক চট্টগ্রামে বেশিদিন টেকে না। পাভেলের বক্তব্য এক্ষেত্রে অনেকটাই স্পষ্ট, 'বাংলাদেশে যে সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নাই,

আমি তার পেছনে সময় নষ্ট করতে রাজি না।' আন্দালিব কিছুটা হেসে আমাদের বললেন, 'চট্টগ্রামের ছেলেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পর্ক করতে চাইলে

ঢাকার ছেলেদেরকেই পছন্দ করে। ঢাকা থেকে কেউ আসলে হোটেলের সামনে অনেক সময়ই লাইন পড়ে যায় (হাসতে হাসতে)'।

বিয়ে

চট্টগ্রামের বেশিরভাগ সমপ্রেমীই বিয়েকে তাদের জীবনে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মনে করেন। পুরুষ হয়ে জন্মালে একটা মেয়েকে বিয়ে করবার কোনো বিকল্প নেই বলেই তারা মতামত দিয়েছেন। শরীরী চাহিদার থেকে সামাজিক বাস্তবতাকে আলাদা রাখতে তাই অনেকেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এক্ষেত্রে সমাজ, পরিবার এমনকি বন্ধুবান্ধব কিংবা অফিসের সহকর্মীটির চাপের কথাও অ-উল্লেখযোগ্য নয়। 'সমপ্রেমী কিংবা বিষমপ্রেমী, কোনোপ্রকার বিয়ের প্রতিই আমার আগ্রহ নেই, আমার জীবনের সবচেয়ে ব্যক্তিগত এই সিদ্ধান্তে পুরো সমাজের চূড়ান্ত নাক গলানো দেখে আমি হতাশ', জানাচ্ছিলেন কাব্য। 'আমার কোনো মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়নি আজ পর্যন্ত, হয়তো বিয়ের পরে আমার মেয়েদের ভালোও লাগতে পারে! আমি জানি না আসলে', বলছিলেন রুবেল। তবে বাধ্য হয়ে বিয়ে যদি করতেই হয় এবং বিয়ের পরেও ছেলেদের সাথে সম্পর্কের আদান-প্রদান চলতেই থাকে তবে কোনোরকম আত্মগ্লানি তৈরি হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে হাসান জানালেন, 'বাংলাদেশের সব বউরা কি স্বামীদের সব কথা জানে?' তবে একবাক্যে সবাই স্বীকার করলেন, বিয়ে করলেও বৈবাহিক জীবনে জটিলতা তাদের পিছু ছাড়বে না।

পরিবার

চট্টগ্রামে বেড়ে ওঠার সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ামকগুলোর মধ্যে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে আগ্রাসী। কোন স্কুলে ভর্তি হবে, কোন সাবজেক্টে অনার্স করবে, কি রকম বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিবে, কতক্ষণ ফোনে কথা বলবে থেকে শুরু করে জুতো কেনার রঙটা বাছাই করতেও পরিবারের সিদ্ধান্ত প্রবল ভূমিকা পালন করে। ঢাকার চাইতে চট্টগ্রামে পরিবারের সকলের একসাথে থাকার প্রবণতাও অনেকটা বেশি। শুধুমাত্র শক্ত পারিবারিক বন্ধনের কথা মাথায় রেখেই অনেকে সম্পর্কে জড়াতে সাহস করে না কিংবা বিয়ের জন্য বাধ্য হয় বলে জানালেন রূপবানকে।

আউট এন্ড লাউড!

'আমার বাসায় কেউ জানতে পারলে সোজা ত্যাজ্যপুত্র করে দিবে আমাকে', কাব্য অনেকটা নিরাসক্ত গলাতেই কথাটা বললেন। ইফতি তার বন্ধু কিংবা অফিসের কলিগদের কারো কারো সাথে তার প্রবৃত্তি নিয়ে আলাপ করলেও বাসায় কাউকে জানানোর প্রশ্নই আসে না বলে উড়িয়ে দিলেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাবা-মাকে বিষয়টা জানানো অনেকেই আত্মঘাতী বলে মনে করেন। নাফিস বললেন, 'আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিবে, আর সেই সাথে মামা, চাচা, খালুদের জানিয়ে আমাকে এক বিতিকিচ্ছিরি লজ্জায় ফেলবে।' তবে আস্তে আস্তে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ বলে অনেকে মনে করেন। কাছের মানুষদের কাছে বিষয়টা জানানোর পর লজ্জার চেয়ে মানসিক সহযোগিতাই বেশি পেয়েছেন বলে জানালেন বাবু।

ধর্ম

বারো আউলিয়ার চট্টগ্রামে ঐতিহাসিকভাবেই ধর্মীয় প্রভাব প্রবল। ছোটবেলা থেকেই নামাজ শিক্ষা কিংবা মাদ্রাসার পাঠ পার করে আসতে হয়েছে অনেককেই। ছোটবেলা থেকে মজ্জাগত ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে অনেকেরই তাই প্রবৃত্তিগত সংঘর্ষ বাঁধে। 'ধর্মীয় দিক ভাবলে অনেক সময় মনে হয় পাপ করছি, কোনো একটা ভুল কাজ করছি। আবার সেই সাথে এটাও মনে হয়, যে খোদা আমাদের সৃষ্টি করলেন, তিনি তো আমাদের এভাবেই তৈরি করেছেন। কেবল ভালোবাসার জন্য তো আমার খোদা আমাকে ঘৃণা করতে পারেন না।' 'ছোটোবেলায় অনেক পাপবোধ কাজ করতো, নামাজ পড়ে কান্নাকাটিও করতাম, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এখন মনে হয় কারো সাথে অন্যায় কিছু তো করছি না, তাহলে কেন আমি অপরাধী হবো?', জানালেন বাবু।

সমপ্রেমী নারী

বরাবরের মতোই সমপ্রেমী নারীর প্রশ্নে সকলেই অন্ধকারে! চট্টগ্রামে

Scanned with MOBILE SCANNER

সমপ্রেমী নারীরা কিরকম সংখ্যায় আছে, কোথায় কিভাবে দেখা করে, কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়, এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব কেউ দিতে পারেনি। তবে চট্টগ্রামে নারী সমপ্রেমীরা যে একেবারেই অদৃশ্য, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোথায় যাই

চট্টগ্রামে প্রেম, ভালোবাসা কিংবা নিছক আড্ডাবাজি-এর জন্য কোথায় বসা হয়? এর জবাবে 'সি আর বি'-এর কথা বলল অনেকেই, যদিও সন্ধ্যার পরে সেখানে বসা যায় না। ন্যাভাল-এর কাঁকড়া ভাজা এর সুনামও বেশ শোনা গেল, চট্টগ্রাম শহর থেকে একটু দূরে এই জায়গায় যেতে ১৫০ টাকার বেশি সিএনজি ভাড়া লাগবে না। এছাড়া দূরে কোথাও যেতে হলে পতেঙ্গা কিংবা কক্সবাজার আর হাতের কাছে অগ্রাবাদের আখতারুজ্জামান বা সানমার্টের মতো শপিং মলগুলো তো আছেই। বাবু জানাচ্ছিলেন নিরিবিলি এবং লম্বা সময় ধরে কথা বলা যায় বলে ওয়াসা মোড়ের ধাবা কিংবা তাওয়া এর মতো রেস্তোরাঁগুলোতে বসতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

তিনশো সাতাত্তর

'শুনেছেন কিনা বাংলাদেশের আইনের তিনশো সাতাত্তর ধারার কথা?' আমরা বেশ অবাক হলাম যে বেশিরভাগই এই আইনের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। যারা অল্প বিস্তর জানেন, তাদের ধারণাও ধোঁয়া-ধোঁয়া এবং অস্পষ্ট। অনেকেরই ধারণা সমপ্রেমী বিয়ে আইনসিদ্ধ করা হয় এটা দিয়ে, কেউ কেউ মনে করেন এই আইনের পর রাস্তাঘাটে অবাধে সবাই যৌনতা করতে পারবে। তবে রূপবান টিমের কাছ থেকে আইনের ব্যাখ্যা শোনার পরে সকলেই জানালেন যে কেবল তাদের পছন্দ-অপছন্দের উপর ভিত্তি করে তারা কেউই জেলে যেতে প্রস্তুত নন। তবে অনেকটা নিষ্ক্রিয় এই আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করার পক্ষপাতীও বেশি মানুষ নন।

চট্টগ্রামের 'মিথ'গুলো

পরিবেশ হালকা করতে চট্টগ্রামের ছেলেদের নিয়ে প্রচলিত 'মিথ'গুলো নিয়েও আলাপ হলো। চট্টগ্রামের ছেলেদের মধ্যে সমপ্রীতির পরিমাণ বেশি কিনা জানতে চাইলাম আমরা। চট্টগ্রামের বহুল প্রচলিত 'পোয়াখোর' বা সংক্ষেপে 'পিকে' শব্দটি এখন ওখানে কমবেশি সবারই জানা। কেন এরকম শব্দের উৎপত্তি হলো জানতে চাইলে কাব্য জানালেন, 'চট্টগ্রাম তো এক শ বছরের বেশি সময় থেকে 'পোর্ট' ভিত্তিক একটা নগরী, একসময় পাথরঘাটার দিকে বন্দর ছিলো, যেসব বিদেশি পুরুষেরা ব্যবসা করতে আসতো তারা পটিয়া, সাতকানিয়া, বোয়ালখালি কিংবা কক্সবাজার যাবার পথে পথে অনেক ছেলের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তো। তাছাড়া মার্মার রেঙ্গুইন থেকে আসা ছেলেদের মধ্যে সম-প্রবণতা বেশি ছিল বলেও অনেকে মনে করে।' এছাড়া চট্টগ্রামে ছেলে ছেলেদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অনেকসময়ই বন্ধুত্বকে ছাড়িয়ে ভালোবাসায় রূপ নেয়।

গেট-টুগেদার

কারো জন্মদিন কিংবা সম্পর্কের বার্ষিকী কিংবা নিছক শীতের রাতে বারবিকিউ উদযাপন, ঢাকাতে এসব বাহানাতে সমকামিদের মানুষগুলো একসাথে হয়ে প্রকাশ বন্ধুত্ব উদযাপন করে। এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়েই মানুষ একে অন্যের কাছে আসে, বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়, কিছুটা হলেও তৈরি হয় 'কমিউনিটি সেন্স'। এদিক দিয়ে চট্টগ্রামে এখনো সেরকম কোনো 'গেট-টুগেদার' করা সম্ভব হয়নি বলেই জানা গেল।

শহরের বাইরে

শহরে যাদের ঘরে কম্পিউটারের পিছনে ইন্টারনেটের একটা তার লাগানো আছে, তাদের কথা ছেড়ে শহরতলীর বাইরে কি হচ্ছে সেটা নিয়েও আমাদের আগ্রহ ছিল। চট্টগ্রাম শহরের আশে পাশের গ্রামগুলোতে কি সমপ্রেমী নেই, সেখানে কি কোনো ছেলে অন্য ছেলেকে পছন্দ করতে পারে না? অবশ্যই সেখানেও এরকমটা আছে। তবে শহরের শিক্ষিত মানুষেরাই এতো তথ্যের মধ্যে ডুবে থেকেও যখন এতোটা কম জানেন বা কম ভাবেন, গ্রামের দিকে অবস্থাটা আসলে আরো করুণ। 'বন্ধু-বান্ধব কিংবা অচেনা মানুষের চোখের ভাষা দেখেই হয়তো তাদেরকে সমমনস্ক কাউকে খুঁজে নিতে হয়', বলছিলেন সুমন।

পাঁচ বছর পরে

পাঁচ বছর পরে চট্টগ্রামে সমপ্রেমীদের চিন্তা-ভাবনা কিংবা সামাজিক কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা প্রশ্নের জবাবে সকলেই বললেন তারা আশাবাদী। ধীরে ধীরে মানুষেরাও তাদেরকে বুঝতে শুরু করবেন এবং অন্তত ঘৃণার চোখে দেখবেন না, এমনটা আশা অনেকেরই।

রূপবান

রূপবান নিয়ে সকলের কাছেই জানতে চাইলাম। মুখের সামনে কি কেউ আর দুর্নাম করতে সাহস করে। সকলেই প্রশংসা করলো সাহসী পদক্ষেপ বলে। আমাদের কথা বলবার জন্য আসলে কোনো একক বড় 'প্লাটফর্ম' নেই, সেক্ষেত্রে রূপবান একটা বড় আশার জায়গা তৈরি করেছে সকলের মধ্যে। তবে হুট করে বড় উত্থানের আশা না করে ধীরে চলো নীতিতে এগিয়ে যেতে বললেন অনেকে।

চট্টগ্রামের ছোট্ট এই সফর আমাদের সামনে নতুন এক জানালা খুলে দিলো, অনেক অজানা তথ্যের উন্মোচনের পাশাপাশি পেয়ে গেলাম কিছু নতুন বন্ধুর খোঁজ। সম্পূর্ণ অজানা কিছু মানুষের সাথে সবাই এসে যেভাবে খোলামেলা কথা বলেছেন তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি ভালোবাসাকে সবাই ভালোবাসা হিসেবেই চিনতে শিখবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ভালোবাসায় সিক্ত হোক চট্টলার মাটি, মহাকবি আলাওলও তো তাই চেয়েছিলেন,

প্রেম বিনে ভাব নাই ভাব বিনে রস
ত্রিভুবনে যাহা দেখি প্রেম হুনতে বশ
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর
মুক্তি পাইল সে প্রেমের ঠাকুর। ■

Scanned with
PDF SCANNER

ভৃত্য, প্রভুকে!

রিকশায় পাশাপাশি বসে জড়িয়ে ধরেছি তোমার পেশীবহুল বাহু,
বহুবার তোলা হাতের ছত্রছায়ায় নির্মম ভাবে খুন করেছি ভদ্রতাকে,
তারপর কানের কাছে ঝড়ের বেগে মুখটি এগিয়ে নিয়ে, ফিসফিস
করে বলেছি, তোমাকেই চাই।
তোমার ঠোঁটের কোনায় দেখেছি তাচ্ছিল্যের নাচন
খুব স্বাভাবিকভাবে তোমার উচ্চারিত, 'দেখা যাক' শব্দদুটো
খুব অস্বাভাবিক ভাবে আঘাত হানে আমার এয়ারব্রেনে, টেম্পরাল
লোবে তুলেছে আলোড়ন, শিথিল হয়ে এসেছে আমার হাতের
শেকল। নড়েচড়ে বসেছি:
শুকিয়ে আসা ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিয়েছি আলতো করে তারপর,
পোষা কুকুরের মত আবার ঘেঁষেছি তোমার শরীরের সীমানায়।
তুমি জানতে আমার দুর্বলতা, আমার পাগলামি
তুমি জানতে বিছানায় চুরচুর করে ভেসে যেতে আমার কোন দ্বিধা
হয়না
তুমি জানতে আমার তৃষ্ণা কিংবা ক্ষুধার ব্যাপারগুলো।
আর আমি? আমি জানতাম আমাকে অপেক্ষা করতে হবে
আমাকে অপেক্ষা করতে হয়--তোমার জেগে উঠবার, অগ্রাসী হবার,
শীর্ষবিন্দু স্পর্শের জন্য তোমার, পোড়াতে হয় অনেক কাঠখড় এবং
সেই চিতায় আমার থরথর আবেগ, আকুতি কিংবা তৃষ্ণাকে তরল
জ্বালানীর মত ছড়িয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিত করি সর্বোচ্চ প্রজ্জ্বলন।
আমাকে অপেক্ষা করতে হয় কখন গ্রীষ্মের শেষে বর্ষা, শরত কিংবা
হেমন্ত আসবে আমাদের সম্পর্কের মালভূমিতে।
চাইলেই তুমি পাশ ফিরে শোও, মুখ ঘুরিয়ে নাও, খুব সহজে বুঝিয়ে
দাও তুমিই এই সম্পর্কের 'প্রভু'।
আর আমি? হয়তো ভৃত্য কিংবা কুকুর কিংবা কিছুই না।
হয়তো ভুলটা বারবার করি, তবুও ভালো লাগে। করেই যাই।
ছুঁড়ে ফেলে আবার যখন কাছে ডাকো, ছুটে যাই
হাত ধরে রিকশাতে বসি আর মনে মনে স্বপ্নের বুদবুদ উড়িয়ে দেই
আকাশে আকাশে
হয়তো এই সবই কর্দমাক্ত সম্পর্কের উঁচু-নিচু পথে রোদেলা দুপুর
নিয়ে আসার নিষ্ফল প্রয়াস। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে তাই মনে
করি 'প্রতিবন্ধী', 'প্রতারক', ইত্যাদি তারপরও আমি 'তোমাকে
চাই'।
আসলে প্রেম একটা রোগ, একটা ঘুণপোকা, একটা ন্যাকামি। ■

লেখক: শুভ
ইলাস্ট্রেশন: ইন্টারনেট

Scanned with MOBILE SCANNER

জুলাইয়ের ৩

আমার মা অঙ্কে ভীষণ ভালো ছিলেন, ক্লাস ফাইভে উঠার পর আমার শক্ত বীজগণিতের হাতে খড়ি মায়ের কাছ থেকেই হয়েছিল। সেভেনে উঠার পর আমার আজন্ম রান্নাঘরে বন্দী মা যখন পাশের বাড়ির আন্টির সাথে বাটিকের কাজ শেখায় মন দিচ্ছিল, তখন পরীক্ষায় গণিতে আমার নম্বরপ্রাপ্তির ধারাবাহিক নিম্নগতির সব দায় বাবা অনায়াসেই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। অনেক হই-হট্টগোলের পর ঠিক হল বাসায় অঙ্কের মাস্টার আসবে। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে সব বিষয়ে মুড়িমুড়কির মতো গৃহশিক্ষক রাখার চল ছিল না। বাসায় স্যার এসে অঙ্ক কষাবে শুনে আলকাতরার মত কালো মুখ করে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলাম! যাই হোক, যাদৃশি ভাবনা তশ্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশি। অনতিকালের মধ্যে বাসায় এক নতুন যুবকের অনুপ্রবেশ ঘটল। মাঝারি গড়নের শ্যাম বরণের এলোচুলের সেই যুবকের সাথে জুলাইয়ের তিন তারিখে কয়েক ঘন্টার জন্য দরজা বন্ধ এক অন্ধকার ঘরে আটকে ছিলাম আমি।

আগে কোনোদিন বাসায় গৃহশিক্ষক না থাকায় বাসায় স্যার এসে অঙ্ক বুঝিয়ে যাবার এই পুরো পরিকল্পনাটাই আমার কাছে ভীতিকর ছিল। ভয়টা প্রথম দিনেই ও ভেঙে দিয়েছিল। আমি তখন কেবল হাফপ্যান্ট পরি, ওর কেতাদুরস্ত ইন করা শার্ট-প্যান্টের সামনে বসতে শুরুর দিকে কেন জানি তাই লজ্জা লাগত! লজ্জা জিনিসটা কি, সেটা কি ঠিকঠাক বুঝি তখন আমি? আমাকে খুব করে বলতো যেন আমি ওকে ভাইয়া বলে ডাকি, আমি স্যার বলতাম। 'স্যার', শুরু থেকে শেষ অবধি এটাই ওর প্রতি আমার সম্বোধন ছিল।

এই প্রশ্নটা জীবনে অনেকবার শুনেছি, প্রথম কবে টের পেলাম যে আমি ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট। আমি নিজেকে অসংখ্যবার খতিয়ে-তলিয়েও এর জবাব খুঁজে পাইনি কোনোদিন। শুধু মনে আছে ক্লাস এইটে পড়ার সময় একদিন স্যারকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। সেই ফর্মাল প্যান্ট, গায়ে ধবধবে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি, গেঞ্জির ফাঁক গলে শরীরের অনেকটা উঁকি-ঝুকি মারছে। আমি পুরো গেঞ্জির উপর দিয়ে হাত বোলাচ্ছি, হাত নামাচ্ছি। প্রথমে ধীর লয়ে শুরু হয়ে সেটা গতি পাচ্ছে, এরপর আরো গতি, আরো গতি। হাত বুক-পেশী-পেট ছাড়িয়ে আরো সব অজানা জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম, ফ্যানের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে যেন সম্বিত ফিরে পেলাম, ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে আছি আমি। সেই কি আমার নিজেকে আবিষ্কারের শুরু?

অঙ্ক করার সময় প্রায়ই ওর শক্ত-শক্ত শরীরটার দিকে আড়চোখে তাকাতাম আমি। সাতাশ বছরের সোমত্ত এই লোকটা সারাক্ষণ খুব পরিপাটি হয়ে থাকতে ভালোবাসতো। সব সময় ফর্মাল শার্ট-প্যান্ট আর বুক পকেটে মেটাডোরের লাল রঙের সেই কলমটা। অঙ্ক করতে করতে ওর গাল, ঠোঁট, নাক, চিবুক থেকে শুরু করে সারা শরীরের আমার চোখ চষে বেড়াতো। একদিন খুব সাহস করে গালে ময়লা লেগে আছে বলে ওর খোঁচা দাড়ির ভেতরে হাত বোলাতে বোলাতে পুরু ঠোঁটের উপরেও আঙুল ছুঁইয়ে নিয়েছিলাম। সেই ন্যানো সেকেন্ডের স্পর্শ, সেই তীরতীরে কাঁপনের বেগ আজও স্মৃতিতে ঝড় তোলে।

ক্লাস নাইনে উঠার পর কেন যেন গোঁ ধরলাম মোবাইল কিনব। তখন মোবাইল কি জিনিস আমার বয়সী ছেলেরা সেটাই জানে না ঠিক মতো। আমি বরাবর ভালো ছাত্র, মায়ের কাছে তাই আমার বেশিরভাগ আহ্লাদই প্রশ্রয় পায়। ঠিক হল স্যারও যাবে আমার সাথে মোবাইল কিনতে। ইস্টার্ন প্লাজায় যাব, বাড়ির

Scanned with CamScanner

সামনে থেকে রিকশা ঠিক করা হল। এই প্রথম ওর সাথে রিকশায় উঠছি, বরাবরের মতো সাদা চেক শার্টের সাথে কালচে ফর্মাল প্যান্ট পরে ফিটফাট হয়ে এসেছেন তিনি, চোখে সানগ্লাস। রিকশায় গায়ে গা ঘেঁষে বসেছি আমরা। আমার হাত ওর হাতের সাথে লাগোয়া, ওর পক্ষে রিকশার অনবরত কাঁপন থেকে কিছুতেই আমার শরীরের কাঁপন আলাদা করা সম্ভব হয়নি সেদিন। কোথাকার কোন মোবাইল, আমার মনে হচ্ছিল এই লাগোয়া শরীরের উত্তাপ আমাকে গলিয়ে মেরে ফেলুক। মেরেও ফেলেছিল হয়তো, সেটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল আমার। নিতান্ত কৈশোরে প্রেম বলে জীবনে যে উত্তেজনার ফোয়ারা ছুটল, এই মানুষটাই তার আগাগোড়া স্রষ্টা হয়ে রইল।

আস্তে আস্তে ওকে না দেখলে আমার অস্বস্তি লাগা শুরু হল। ছেলেরা স্যারের কাছে পড়তে না বসার বাহানা খোঁজে, আমি ঐ লোকটাকে শুক্রবারেও অঙ্ক বোঝাতে আসতে বলা শুরু করলাম। আমার মা ছেলের এই গণিত প্রীতিতে গদগদ, আমি তখন ঐ লোকের প্রেমে গদগদ! ওকে না দেখে থাকতে পারি না, লুকানো ডায়েরির পৃষ্ঠা পুরতে থাকে নাম-সংজ্ঞাহীন প্রেমের স্তুতিতে। লোকটা মেসে থাকে, ঠিক মতো খায় কি না ভেবে ভেবে অস্থির হই, মাকে বলিয়ে প্রায়ই বাসায় খাওয়াতে শুরু করলাম। ততদিনে আমাদের ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক অনেকটাই নমনীয়। আমি ওর থেকে বই ধার করে পড়ি, বাসায় কেউ না থাকলে এক সাথে টিভি দেখি, রাজনীতি নিয়ে আলাপ করি, বৃষ্টি আসলে হাত ধরে বারান্দায় টেনে নিয়ে যাই। দিনকে দিন অব্যক্ত সেই প্রেম কল্পনার তুঙ্গে ওঠে। টিফিনের জমানো টাকায় ওর জন্মদিনে আমার কেনা শার্টটা দেখে ওর চোখে যেদিন প্রায় পানি চলে এসেছিল, নিজেকে সেদিন সার্থক প্রেমিক মনে হয়েছিল।

জুলাইয়ের তিন তারিখের ঐ অন্ধকার দুর্যোগের সন্ধ্যাটায় আমার বিকট নিস্তব্ধতা তখন চীৎকার করে বলছিলো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসি। তুমি আমার স্বর্গ দেবতা এরস, তুমি আমার ঈশ্বর, আমাকে তোমার বুকের টক-টক গন্ধ নিতে দাও।

একবার জ্বরে পড়ে বেশ কয়েকদিন না আসতে পারায় একদিন বাসা খুঁজে খুঁজে হরলিক্সের একটা বয়াম নিয়ে ওর মেসে হানা দিয়েছিলাম। এই প্রথম অপরিপাটি ক্লান্ত ওকে দেখলাম। আমাকে ঐ অবস্থায় ওর মেসে দেখে ওর বোকা বোকা অপ্রস্তুত হাসিটা এখনো মনে পড়ে আমার। আর তারপর, জুলাইয়ের তিন তারিখ!

সেদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড মেঘ ছিল আকাশে, মা কাপড় কিনতে গাউসিয়া গেছে, বাসায় কেউ নেই। ও পড়াতে আসার একটু বাদেই প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হল। কেন যেন ও খুব আনমনে হয়ে আছে, আমি এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার বারান্দায় গিয়ে বৃষ্টি দেখে এসেছি। হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসে আছি। পড়তে পড়তে আমাদের মাঝে এমন নীরবতা মাঝে মাঝে এসে যায়, আমরা কেউ এতে অনভ্যস্ত নই। কিছুক্ষণ বাদে ও বলল, বাসায় মোমবাতি নেই? আমার পক্ষ থেকে কোনো জবাব নেই। বাইরে দুর্দান্ত শব্দ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে আর সেই সাথে সেই সাথে পাল্লা দিয়ে হাওয়া বইছে। আমার বুকেও তখন দুর্যোগের ঢাক বাড়ি দিচ্ছে, হঠাৎ কি হল জানি না, সবটুকু সাহস জোগাড় করে ওর হাতের মুঠিটা চেপে ধরলাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম ও একটুও চমকালো না।

'স্যার, আমি আপনাকে অনেক পছন্দ করি!' একদম এক নিঃশ্বাসে শরীরের সবটুকু শক্তি ঢেলে কথাটা বললাম।

'আমিও তোকে অনেক পছন্দ করি, আমার একটা ছোট ভাই থাকলে তোর মতোই কেউ হতো।' আমার হাতটায় আলতো একটা চাপ দিয়ে অন্ধকারেই ওর জবাব ভেসে এলো।

আমার দিগ্বিদিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল কিনা জানি না, সবকিছু ভুলে আমি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে লাগলাম। ও কোনোমতে টাল সামলে উঠে দাঁড়ালো আমাকে নিয়ে। আমার মুখ শক্ত হয়ে ওর বুকের সাথে মিশে আছে, আমার দু'গাল ভাসা পানির প্লাবনে ওর শার্ট ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। জুলায়ের তিন তারিখের ঐ অন্ধকার দুর্যোগের সন্ধ্যাটায় আমার বিকট নিস্তব্ধতা তখন চিৎকার করে বলছিল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসি। তুমি আমার স্বর্গ দেবতা এরস, তুমি আমার ঈশ্বর, আমাকে তোমার বুকের টক-টক গন্ধ নিতে দাও, একবার ঐ ঠোঁটের পরে ঠোঁট রেখে আমাকে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে দাও!

কিন্তু আমার মুখে কোনো ভাষা ছিল না। জুলাইয়ের তিন তারিখের সেই গোলমেলে সন্ধ্যাটায় ওর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে কেবল কান্না লুকাতে চেয়েছিলাম আমি। আমার নীরবতার কোনো ভাষা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ঐ অতো দুর্যোগের মাঝেও ও আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছিল সেটা টের পাচ্ছিলাম। স্পষ্ট স্নেহের সেই স্পর্শ আমার চুলের মাঝে পথ করে নিচ্ছিল, সেই প্রথম, সেই শেষ।

জুলাইয়ের তিন তারিখের ঐ সন্ধ্যাটার পর স্যারের সাথে আমার সম্পর্কটা আর আগের মতো প্রাণোচ্ছল থাকেনি। আমাদের দুজনের মাঝেই ঐ হাওয়া-বৃষ্টির সন্ধ্যাটা যেন কেমন একটা অস্বস্তিকর দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়। ও যখন বিসিএস পেয়ে ঢাকার বাইরে পোস্টিং-এ চলে যাবে শুনি, অবিশ্বাস্যভাবে আমার স্বস্তি লেগেছিল। ওর সংকোচের দৃষ্টির কাছে আমার অভিমানী প্রেম যেন কুঁকড়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেল।

আজ অফিসে যাবার পথে ওকে এভাবে দেখব ভাবিনি, মুটিয়ে গেছে অনেকটা, চোখেমুখে ক্লান্তি। ওর সাথে বছর দশকের একটা স্কুল ড্রেস পরা বাচ্চা ছেলের হাত, ওর তাহলে ছেলে হয়েছে! পুরোটা দিন অফিসে স্মৃতির জঞ্জাল হাতড়ে বাসায় ফিরলাম। ড্রয়ারের তালাটা খুলে একটা বড় খাম বের করলাম। গাইবান্ধায় যাবার পর আমার প্রথম জন্মদিনে শেষের কবিতা বইটা কুরিয়ারে পাঠিয়েছিল ও। বইটা খুলতেই সেই ছবিটা খাটের উপর উড়ে পড়ল, ছবিটার উলটো পাশের লেখাটা আরেকবার পড়লাম,

'একটা ছবি চেয়েছিলি আমার, পাঠিয়ে দিলাম। তোর জন্য মনটা খুব পোড়ে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে সব ছেড়ে-ছুড়ে তোর মাথায় আরেকবার হাত বুলিয়ে দেই। তোর ইচ্ছে করে না? শুভ জন্মদিন!'

Scanned with MOBILE SCANNER

সমপ্রেম বনাম শিশু যৌন নির্যাতন

অসমর্থিত জনশ্রুতি অনুযায়ী ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের আজমিরীগঞ্জ নিবাসী জনৈক আচার্য রাধাভাবের নানা লীলাখেলার মধ্যে তন্ময় হয়ে থাকতেন। ক্রমে তার শিষ্য সংখ্যা বাড়তে লাগল। নিম্নশ্রেণীর বহু বালকও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই ছেলেদেরকে উক্ত আচার্যের সখী সাজানো হত এবং তারা নাচে-গানে রাধার বিরহের বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করতো। পরবর্তীতে এমন সব বিভিন্ন বিরহ সঙ্গীতের সমন্বয়ে গড়ে উঠে 'গাঁড়ু' গান যা ধীরে রূপ নেয় 'ঘাটু' গানে। প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ যখন এই 'ঘাটু' গানের সাথে জড়িতদের জীবন নিয়ে 'ঘেটুপুত্র কমলা' নির্মাণ করেন, তার জীবদ্দশাতে বহু সাক্ষাৎকারে তিনি সেই সময়কার শৌখিন জমিদারদের সাথে 'ঘেটু' ছেলেদের স্থাপিত শারীরিক সম্পর্ককে 'সমকামিতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মোটেই আশ্চর্য্য হবার বিষয় নয় যে, দেশের প্রথম সারির পত্রিকা থেকে শুরু করে ফেইসবুক, ব্লগ কিংবা সর্বত্রই অধিকাংশ লোক একে এক বাক্যে সমকামিতা হিসেবে আখ্যা দেয়।

বাংলাদেশের মতো যৌন সংবেদনশীল দেশে, যেখানে যৌনতা ব্যাপারটি নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাই কথা বলতে নিদারুণ অস্বস্তিতে ভোগে, সেখানে শিশুদের, বিশেষত ছেলে শিশুদের যৌন সুরক্ষার ব্যাপারটি নিতান্তই অবহেলিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে গেছে। সেই অজ্ঞতার দেয়ালে শ্যাওলা জমতে জমতে শিশুকাম বা শিশুদের সাথে কৃত যৌন নিপীড়নকে বেশির ভাগ মানুষ সমপ্রেমের সাথে জড়িয়ে ফেলে। মাদ্রাসাগুলোতে হরহামেশা এরকম ঘটনা ঘটার পর তাকে বিকৃত সমকামিতা হিসেবে প্রচার করা হয়ে থাকে।

এক গবেষণায় দেখা যায়, আমেরিকাতে শতকরা বিশ ভাগ শিশু বেড়ে ওঠার কোনো এক পর্যায়ে অনভিপ্রেত যৌন অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন। যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান, শক্তি কিংবা সাহসের অভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের যৌন নির্যাতনকে বলা হয় শিশুকাম। এক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের সাথে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন, শিশুদের যৌনাঙ্গে হাত দেয়া কিংবা তাদেরকে দিয়ে জোর করিয়ে যৌন তৃপ্তি লাভের চেষ্টা শিশু নির্যাতনের কিছু উদাহরণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিশুটি যদি ছেলে এবং নির্যাতনকারী একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হয়, সেক্ষেত্রে আপনি এই পুরো ঘটনাটিকে সমকামিতা এবং সেই লোককে সমকামী বলে আখ্যায়িত করতে পারেন কিনা। এক্ষেত্রে কিছু শব্দের সাথে আপনার পরিচয় থাকা নিতান্ত জরুরিঃ

যৌন প্রবৃত্তিঃ যৌন প্রবৃত্তি বলতে মূলত একজন মানুষের শারীরিক বা মানসিক আকর্ষণকে বোঝায় যা সে নিজের বিপরীত কিংবা একই লিঙ্গের প্রতি অনুভব করতে পারে।

সমলিঙ্গের দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি স্ব-ইচ্ছায় একে অন্যের প্রতি শারীরিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করে কিংবা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তবে তাদের সমকামী বা সমপ্রেমী বলা হয়।

> এই শিশু নির্যাতনকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে সমপ্রেম বিরোধীরা, এমনকি বহু উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীজন একে কখনো সমপ্রেমের সাথে গুলিয়ে ফেলেন আবার কখনো সমপ্রেম মানেই শিশু নির্যাতন বলে চালিয়ে দেন।

পিডোফেলিয়াঃ অনেক বাংলাদেশীর কাছে অপরিচিত হলেও এই শব্দটি আজকের এই লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ। সর্বজন গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানুযায়ী 'পিডোফিলিয়া' একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সেই মানসিক বৈকল্য যা কিনা তার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের যৌন সঙ্গী হিসাবে পাওয়ার কামনা দ্বারা প্রকাশ পায়।

শিশুকাম/শিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতনঃ তাহলে তো ব্যাপারটা সোজা হয়ে গেল, 'পিডোফাইল' মানেই শিশুকামী/নির্যাতনকারী! না, ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা ওখানেই থেমে থাকেনি। 'পিডোফিলিয়া'কে মানসিক বিকৃতি হিসেবে ধরা হলেও অধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায়, সকল 'পিডোফাইল' ব্যক্তি হয়তো শিশু নির্যাতক নন এবং এদের অনেকেই শিশুটির প্রতি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন কিংবা এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। একজন 'পিডোফাইল' মাত্রই শিশু নির্যাতনকারী নাও হতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক শিশু নির্যাতনকারী ঐ শিশুটির প্রতি শারীরিকভাবে আকর্ষিত নয়। শিশুদের নির্যাতনকালীন অসহায়ত্বই কেবল তাদের উত্তেজিত করে। সুতরাং একজন নির্যাতনকারী শিশুকামীর যেমন কেবলমাত্র একটি পরিচয় যে সে শিশুকামী, এর সাথে তার যৌন প্রবৃত্তির কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি যে শিশুটিকে সে নির্যাতন করছে সে ছেলে না মেয়ে তার চেয়ে তাকে নির্যাতনে প্রলুব্ধকারী মূল প্রভাবক হচ্ছে সে একজন অসহায় শিশু!

তবে এই শিশু নির্যাতনকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে সমকাপ্রেম বিরোধীরা, এমনকি বহু উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীজন একে কখনো সমপ্রেমের সাথে গুলিয়ে ফেলেন আবার কখনো সমপ্রেম মানেই শিশু নির্যাতন বলে চালিয়ে দেন। সেই ভিত্তিহীন দাবির অসারতা তুলে ধরতেই এই লেখার সূত্রপাত।

প্রথমেই চলে আসে বয়স এবং ইচ্ছার প্রসঙ্গ। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক সমপ্রেমীর মধ্যে যে শারীরিক বা মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার

Scanned with MOBILE SCANNER

মূলে রয়েছে ওই দুজন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে প্রদানকৃত সর্বসম্মতি। একজন শিশু নির্যাতনকারী এক্ষেত্রে এই দুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ভঙ্গ করে থাকেন। অপ্রাপ্তবয়স্কের সাথে যৌন সম্পর্ক শুরুতেই অপরাধের পর্যায়ে পরে, সম্মতি দেবার মতো মানসিক গঠনই শিশুটির তখনো হয়নি, এর সাথে যদি শারীরিক নির্যাতন যোগ হয় তবে তাকে মানুষ হিসেবে মেনে নিতেই অনেক সময় কষ্ট হতে পারে। এরকম নির্যাতন শিশুটির জীবনে সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

সমপ্রেমীদের শিশুকামী হিসাবে আখ্যায়িত করার পিছনে শিশুদের যৌন নির্যাতন নিয়ে মূলধারার দৃষ্টিভঙ্গই বহুলাংশে দায়ী। এখানে সমাজের প্রচলিত 'কলেপচুয়াল' ধারার সাথে বিজ্ঞানের 'টার্মিনোলজিক্যাল' অভিব্যক্তির বিস্তর দূরত্ব লক্ষণীয়। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, একজন পুরুষ শিশুকামী কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এমনকি তার কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ প্রাধান্যও নেই। তার কাছে বয়সটাই মুখ্য, সে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ছেলে হয়ে অন্য ছেলের কাছে যাওয়া সহজলভ্য হওয়ায় তাদের সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করা অপেক্ষাকৃত কম জটিল। যে কারণে মাদ্রাসা কিংবা চার্চগুলোর নানা নির্যাতনের ঘটনা সংবাদের শিরোনাম হয়!

আগেই বলেছি, সমপ্রেমের সাথে শিশু নির্যাতনের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা প্রমাণের জন্য বিস্তর গবেষণা হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'গ্রোথ এবং বির্নবাউম'-এর করা ১৯৭৮ সালের একটি গবেষণা। যেখানে তারা ১৭৫ জন শিশু নির্যাতনকারী পুরুষকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। সেখানে তাদের মধ্যে ৮৩ জন নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিষমপ্রেমী দাবি করেন এবং বাকি ৭০ জনের মধ্যে সূক্ষ্ম সমপ্রেম এবং ২২ জনের মধ্যে উভপ্রেমের প্রভাব ছিল। উল্লেখ্য যে, উভপ্রেমীরা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক যৌন জীবনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশি প্রাধান্য দিতেন।

আরেকটি গবেষণায় ড. ক্যারোল জেনি এবং তার সহকর্মীরা 'ডেনবার' শিশু হাসপাতালের 'শিশু নির্যাতন' বিভাগের ৩৫২টি মেডিকেল চার্ট পর্যালোচনা করেছেন। ১৯৯২তে শেষ হওয়া এক বছরের সেই গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ১%-এরও কম কেসেই নির্যাতনকারী নিজেকে সমকামী হিসাবে দাবি করেছেন।

প্রখ্যাত গবেষক ড. এ নিকোলাস গ্রোথ ১৯৮২-তে প্রকাশিত এক বৈজ্ঞানিক জার্নালে উপসংহার টেনেছেন যে, আজ পর্যন্ত এমন কোনো গ্রহণযোগ্য গবেষণা হয়নি যা সমপ্রেমের সাথে শিশু নির্যাতনের যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছে। তবে এসব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে ড. জেনি পেডিয়াট্রিক্সে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন, সমপ্রেমের সাথে শিশুকামিতাকে মেলানো যতটা না শিশু যৌন নির্যাতিতের সাথে সম্পর্কিত, তার চেয়ে বেশি সম্পর্কিত মূলধারার পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে এবং আসলেই তাই! এটার শুরুটা হয়েছিল সমপ্রেমকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য। যেসব পুরুষ সমাজ, রাজনীতি এবং ধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে বসে আছে, তারাই যে শিশুর উপর যৌন নির্যাতন করার মূল অপরাধী, সেই বাস্তবতা থেকে সবার দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরানোর চেষ্টা চলেছে নিরন্তর।

পাকিস্তানের লাহোরে গত মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে মোহাম্মদ এজাজ নামক আটাশ বছরের এক লোকের হাতে খুন হন তিনজন সমপ্রেমী। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের পর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এজাজ এবং মিলনের পর কড়া ঘুমের ঔষধ সেবন করিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের হত্যা করেন তিনি। পুলিশের কাছে ধরা পড়ে তার কৃতকাজের জন্য অনুশোচনা করলেও তাদেরকে হত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না বলে জানান। এক্ষেত্রে আরো অনুসন্ধানে উঠে আসে, শিশুকালে কোনো একজন পুরুষ দ্বারা তার যৌন নিপীড়নের শিকার হবার গল্প। সেই শিশু নির্যাতনের অভিজ্ঞতাকে সমপ্রেমের সাথে জড়িয়ে নিজের মধ্যেই এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা গড়ে তোলেন এজাজ।

শিশুদের যৌন নির্যাতন একটি ভয়াবহ অপরাধ, শিশুর বেড়ে ওঠায় এর প্রচণ্ড বিরূপ মানসিক প্রভাব পড়তে পারে। আপনার শিশুটি সুরক্ষিত কিনা সেটা খোঁজ করে দেখুন! সেই সাথে এই বিষয় নিয়ে দূর করুন আপনার অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং কূপমণ্ডূকতা। শিশু যৌন নির্যাতনকারীর কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয় বা যৌন প্রবৃত্তি নেই। সে সমপ্রেমী, বিষমপ্রেমী, উভপ্রেমী, পুরুষ, নারী, হিজড়া যে কেউ হতে পারে। একজন শিশু যৌন নির্যাতনকারীর পরিচয় শুধু একটাই, সে একজন নিকৃষ্ট অপরাধী!

Scanned with CamScanner

নারী পাঠ

বয়ঃসন্ধির একেবারে শুরুর দিকটায় ধুন্ধুমার ডায়েরি লেখার অভ্যাস হয় আমার। জীবনের প্রত্যেকটা দিন স্মৃতির হিমঘরে কয়েকটা কালো কালো গুবরে পোকার মতো অক্ষরে অনন্তকাল প্রাণবন্ত করে রাখতে আমার সেই অনির্বাণ প্রচেষ্টা। ভাবতাম বড় হয়ে লেখাগুলো পড়বো, একে-ওকে দেখাবো, আমার ছেলেমানুষী নিয়ে হাসবো। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমার সেই লেখার উৎসাহে ভাটা পড়লো। নিজেকে যতো আবিষ্কার করতে লাগলাম, ভিতরের আমির সাথে আমার লড়াই তুমুলে গিয়ে পৌঁছালো, সেই সাথে বয়ঃসন্ধির হতাশা আর খিটমিটে স্বভাব। এরপর থেকে আর কোনোদিন ডায়রিতে হাত দেয়া হয়নি আমার।

এখন যখন পিছনের দিকে ফিরে চাই, আমার দুঃখ হয়, সত্যি খুব কষ্ট লাগে। আমার জীবনের টুকরো টুকরো সব স্মৃতিগুলো আর কোথাও খুঁজে পাবার উপায় নেই। প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে যাবার কথা কোথাও লেখা নেই, লেখা নেই ভার্সিটির প্রথম দিনটার কথা, প্রথম প্রেমের কথা, প্রথমবারের মতো প্রেয়সীর হাতে হাত রাখা কিংবা চারুকলার সামনে থেকে কেনা সেই টিপ তোমার কপালে পরিয়ে দেবার কথা। প্রথম সেই মুহূর্তের পিঠে যোগ হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা আরো অগণিত ছোট-বড় সব মুহূর্তের ভান্ডার, আমার সেই অপরিমিত গল্পের ভান্ডার কোথাও লেখা রইলো না। যদি থাকতো, জীবনের অনেক মুহূর্তই হয়তো নতুন মুহূর্তের ভিড়ে মস্তিষ্কের নিউরনের অলিতে গলিতে চিরকালের মতো নিখোঁজ হয়ে যেত না।

ডায়েরিতে লেখা থাকলে আরো স্পষ্টভাবে হয়তো মনে পড়তো যে কবে থেকে বুঝতে পারলাম আমি মেয়ে হয়েও মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট। তবে এটুকু মনে পড়ে, এই বোধটা একদিনে জন্মায়নি। যখন ক্লাশ টু'তে পড়ি, পাগলের মতো ইংরেজী 'মিসে'র প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম! প্রেম কি সেটা বুঝতাম কিনা তখন কে জানে! বড় হলাম যখন, আমার সাথে পড়ুয়া অন্য সব সুন্দর ছেলেদের পাশ কাটিয়ে আমার প্রেমের তীর কেবল গিয়ে বিধত আমার বান্ধবীদের দিকে! অথচ মজার ব্যাপার হলো, আমি নিজে কখনো দ্বিতীয়বারটি ভেবে দেখিনি আমি কেন এমন অস্বাভাবিক প্রেমে পড়ছি। এই ভালো লাগাটাই যেন আমাকে আমার সত্তায় ফিরিয়ে আনত, যেন নিজেকে খুঁজে পাওয়া। আমার মোরগ পোলাও খেতে ভাল্লাগে, খিচুড়ি ভালো লাগে না, এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে? ভালো লাগা আর না লাগায় অস্বাভাবিকতা খুঁজে মরার চেয়ে ভালো লাগা নিয়ে ভালো থাকাটা কি জরুরি নয়? এরপরে জীবনে অনেক মেয়ের গল্প শুনেছি, অনেকের কাছে গিয়েছি, এদের অনেকেই নিজের এই প্রবৃত্তি নিয়ে ভয়াবহ অস্বস্তিতে ভোগে, অনেকেই নিজেকে জোর করে ছেলেদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি কি বড় কোনো ভুল করেছিলাম নিজের ভালো লাগাকে এতোটা গুরুত্ব দিয়ে? ক্ষণিকের মধ্যেই সেই আশঙ্কা বাতিল করে দেই। বাইরের হাজার মানুষের সাথে লড়াই করা সম্ভব, কিন্তু নিজের সাথে কি যুদ্ধে টেকা যায়?

অনেক দিন থেকেই শুনে আসছি, কারোর কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে হলে সবার প্রথমে নিজেকে ভালবাসতে জানতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে, আমি যা সেটা দুনিয়া মেনে নেবার আগে আমার নিজের মেনে নেয়াটা অসম্ভব জরুরি। বাংলাদেশের মতো দেশে একটা মেয়ের নিজেকে সমপ্রেমী হিসেবে মেনে নেয়া কতটা কঠিন হতে পারে সেটা সহজেই আন্দাজ করা যায়। সামাজিকভাবে মেয়ে হয়ে জন্মানোই এই দেশে এখনো অনেকে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পারে না। অনেক পরিবারই মেয়ে হবার পর ছেলে না হবার দীর্ঘশ্বাস গোপনে লুকায়। একটা মেয়ে হয়ে নিয়ম ভেঙ্গে জীবনটাকে আবিষ্কারের জন্য এক পা বাড়াতেই পরিবারের মানুষগুলোই সবার আগে পায়ে বেড়ি পরাতে এগিয়ে আসে। পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তা যেন পুরুষের হাতেই বন্দী, ঘর থেকে বেরোবার আগে ভাই বা পুরুষ কাউকে সাথে রাখা, নিজের ইচ্ছামতো কাপড় পরতে না পারা, নিজের শরীর নিয়ে নিজেরই অস্বস্তিতে ভোগা। একটা মেয়ে হয়ে জন্মে এমন অগণিত প্রতিকূলতার ভিড়ে নিজেকে নারী সমপ্রেমী হিসেবে আবিষ্কার কেবল সমস্ত ঝামেলাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তোলা ছাড়া কিছুই করে না। এরকম পরিস্থিতিতে 'আমি নারী সমপ্রেমী' কথাটা নিজের পক্ষে নিজের মানাই কষ্টকর হয়ে যায়। মেয়েদের আত্ম-অস্বীকৃতির মধ্যে থাকা, নিজের ভালো লাগাকে মেনে না নেয়াটা তাই বাংলাদেশে একেবারেই অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়।

আমার অলিখিত ডায়রিতে ফিরে আসি- আমার প্রথম ভালোবাসার মেয়েটার কথা ওখানে লেখা নেই। একটা 'অনলাইন ডেটিং ওয়েব' থেকে ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয়, তখন মাত্র ও-লেভেল শেষ করেছি। বাংলাদেশে ও-ই আমার দেখা প্রথম নারী সমপ্রেমী। শুধু ক্ষণিক কিছু মুহূর্তের জন্য নয়, ওর কাছে চিনতে শিখেছিলাম কিভাবে

Scanned with MOBILE SCANNER

ভালোবাসতে হয়, কাছে আসতে হয়, আদর করতে হয়। সেসব না হয় খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে একটা মজার বিষয় না বলে পারছি না। এসব 'চ্যাট' কিংবা 'ডেটিং-ওয়েব' গুলোতে ছেলেদের মেয়ে সেজে চ্যাট করা একটা মহামারীর মতো ব্যাপার। ভুলভাল ব্যাকরণের ঐ ছেলেগুলো সমপ্রেমী মেয়েদের কামনায় লালায়িত না থেকে অন্য কোনো কাজে মন দিলে এতোদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতি পালটে যেতে পারতো!

মেয়ে হয়ে ভালো লাগার মেয়েকে খুঁজে পাওয়াটা বাংলাদেশে সহজ নয়। অনলাইন পাবলিক ফোরাম গুলো অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এলজিবিটি বিষয় নিয়ে বেশ কিছু ভালো ভালো ওয়েবসাইট আছে, সেখানে নিজের ই-মেইল আইডি দিয়ে রাখলে মানুষজন মেইল পাঠিয়ে যোগাযোগ করে। তবে এখানেও সেই একই বিপদ! ছেলেরা এখানেও আসবে! সবচেয়ে হাস্যকর লাগতো যখন দেখতাম এরা লিখছে যে এরা আমাদের সাহায্য করতে চায়! কিভাবে? আমাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে! তাদের ধারণা আমরা দেখতে এতোটাই কুৎসিত যে অন্য কোনো ছেলে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না আর সেজন্যই আমরা বিপথগামী লেসবিয়ান!

আচ্ছা, আমি আমার প্রথম সম্পর্কের কথা বলছিলাম! কেমন ছিলো সেই সম্পর্ক? আর দশটা সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্কের মতোই! মাথার মধ্যে হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যাওয়া, বুকের মধ্যে অজানা কাঁপনের রেলগাড়ি, পেটের মধ্যে হঠাৎ একগাদা প্রজাপতির ডানা ঝাপট-নি! আর আমাদের সেই প্রথম চুম্বন? সেই আমাদের প্রথম শরীর ঘেঁষে শরীরের কাছে আসা। তাতে শুধু শরীরের চাহিদা ছিল না, ছিল ভালোবেসে বিলীন হবার অনন্ত ক্ষুধা। আর দশটা সম্পর্কের মতোই আমাদের মধ্যেও অনেক মতের অমিল ছিলো, অনেক অপছন্দের জায়গা ছিলো। আমার বন্ধুদের কাছে আমি তখনো বলিনি আমার মেয়েদের প্রতি টানের কথা, ওর সাথে আমার সেই টানাপোড়েনগুলি ভাগ করবার জন্য তখন কেউ আমার পাশে নেই, কারো কাছে মন খুলে বলতে পারিনি আমাদের সমস্যাগুলোর কথা। আমরা অনেক চেষ্টা করেও এই সম্পর্কটাকে শেষমেশ টিকিয়ে রাখতে পারিনি...।

সবচেয়ে হাস্যকর লাগতো যখন দেখতাম এরা লিখছে যে এরা আমাদের সাহায্য করতে চায়! কিভাবে? আমাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে! তাদের ধারণা আমরা দেখতে এতোটাই কুৎসিত যে অন্য কোনো ছেলে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না আর সেজন্যই আমরা বিপথগামী লেসবিয়ান!

আমি নারী সমপ্রেমী, আমার বন্ধুদের কাছে এই স্বীকারোক্তিটি হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। তবে এক্ষেত্রে আমি মহা ভাগ্যবান বলতেই হয়, আমার সব বন্ধুরাই ধীরে ধীরে আমাকে বুঝতে পেরেছে। এক্ষেত্রে খুব ভালো বন্ধু না হলে এরকম স্বীকারোক্তি ঝামেলাকে উলটো বাড়িয়ে তুলতে পারে। আমার বন্ধুরাই আসলে পরবর্তীতে আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে। আমার এক জীবনে এরকম বন্ধুর চাইতে ভালো আর কিছু হয়তো পাবার নেই। বাংলাদেশে পরিবর্তন হচ্ছে, হয়তো খুব ধীরে কিন্তু তবুও যে হচ্ছে, আমার বন্ধুদের আমার প্রবৃত্তির সাথে সহাবস্থান তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ।

ডায়রি না লিখে রাখায় আমার জীবনের অনেক প্রথমই আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে, এটা সত্য। কিন্তু সেই একই সাথে জীবনের চূড়ান্ত খারাপ মুহূর্তগুলোও আর লেখার অক্ষরে কোনোদিন প্রাণ ফিরে পাবে না। আমি জানি জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনাই আমাদেরকে কিছু না কিছু শেখায়, তবে কিছু স্মৃতি চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলাই হয়তো ভালো। সেইদিন, যেদিন প্রথম আমার বাবা-মাকে বলেছিলাম আমার ভালোলাগার কথা, তাদের সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি, আমাকে জোর করে মনোচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া, সেই ঔষুধের উপর বেঁচে থাকা দিনগুলি, এর সব-সবটাই আমি আমার স্মৃতি থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলতে চাই।

জীবনের কাজই হচ্ছে প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দেয়া। সেই সমস্যাগুলো কি করে সামাল দেয়া যায়, দিন শেষে সেটাই দেখবার বিষয়। বাংলাদেশের মতো দেশে নিজের সমপ্রেমী পরিচয়ের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়াটা খুব শক্ত। কিন্তু এই বাঁধা পেরিয়ে এগিয়ে যাবার মধ্যেই কোথায় যেন একটা বিশাল সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে, সে সৌন্দর্য্য জীবনের সৌন্দর্য্য। আমি যা, আমি যেমন, তার জন্য আমি কুণ্ঠিত নই। জীবনের বিশালতার পটভূমিতে আমি কখনো নিজেকে অস্বীকার করে খেই হারাইনি, নিজেকে অস্বীকার করিনি, এই বিস্তৃত ভালো লাগা বোধের কাছে বাকি সবই যেন মূল্যহীন। আজকের জন্য এটুকুই। ভালো থেকো, প্রিয় ডায়রি! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

আমার চোখে বাংলাদেশ

ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়ে দু'পক্ষের সবার সাথেই আমার ওঠা-বসা ছিল। গ্রেড ফাইভে উঠে আমি প্রথম অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের প্রায় সবাই একে অন্যের প্রেমে পড়তে শুরু করেছে! সেবারই প্রথম হয়তো আমি টের পেয়েছিলাম, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আমার মানসিক কোনো টান নেই। সময়ের সাথে সাথে এই আত্মোপলব্ধি আমার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব তৈরি করতে থাকে। বাংলাদেশের অকথিত এই আখ্যাননামা নিয়ে কোনো মিডিয়াই সরব না হওয়ায় আমার ভিতরে জন্ম নেয়া প্রশ্নগুলো আমার ভিতরেই নিঃশেষ হত। কার কাছে যাব, কি জিজ্ঞেস করব, কিভাবে জিজ্ঞেস করব, এমন হাজারো অনিশ্চয়তার দোলাচালে আমার বয়ঃসন্ধি পার করেছি আমি। কারোর সাথেই যে কথা বলার চেষ্টা করিনি, এমনটাও না। আমার খুব কাছের বন্ধু বা বড় দু-একজনের সাথে চেষ্টা করেছি মন খুলে আমার ভিন্নতার কথা বলতে। আমার সবটুকু শোনার পর তাদের কুঁচকানো মুখের স্মৃতি আমার এখনো মনে আছে।

বাবা-মায়ের সাথে দেশের ভিতরে বা বাইরে ঘুরতে যাওয়ার তেমন কোনো স্মৃতি আমার নেই, ঢাকার বাইরে যে একটা জগৎ আছে সেই ব্যাপারটাই কলেজের গন্ডি পেরোবার আগ পর্যন্ত আমার মাথায় আসেনি। অথচ সেই ঢাকা, আমার ঢাকা ধীরে ধীরে আমার প্রিয় কারাগারে পরিণত হচ্ছিল। আমার নিজের আমি যেন চারপাশের দম বন্ধ করা নিস্তব্ধতার মধ্যে একটু খোলা বাতাস চাইছিল। সেই খুনে ঢাকার হাতে আমার আমিকে হত্যার হাত থেকে বাঁচাতেই যেন আমাকে পাড়ি জমাতে হয় আমেরিকাতে। ওখানে গিয়েই হয়তো প্রথম টের পেলাম, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ আমাকে যে ধার্মিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বড় করেছে, আমার ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্যকে ধারণক্ষমতা তার নেই!

গত পাঁচ বছর ধরে আমি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে গেছি, এই সামাজিক অগ্রহণযোগ্যতা এবং অস্বীকৃতিই কি মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়েকে ভালো লাগার প্রশ্নে নীরবতার প্রধান কারণ? বিগত পাঁচ বছরে আমি ভেবেছি, দেশ ছাড়ার আগে, ঢাকা ছাড়ার আগে আমি কেন আমার মতো আর একটা মেয়েকেও বাংলাদেশে খুঁজে পেলাম না? এর মূল কারণ কি ঢাকায় মেয়ে সমপ্রেমীদের অপ্রতুলতা নাকি কোনো এক অজানা ভয়ের বেড়ি? মেয়ে হয়ে জন্মাবার পরেও আমি পরিবার থেকে যে সুবিধাটা পেয়েছি, বাংলাদেশের অন্য অনেক মেয়েই নানান নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপ পার করে তার কাছে হয়তো পৌঁছাতে পারে না। আমি অবাধে ছেলে-মেয়ের সাথে মিশতে পেরেছি, তাদের কাছে এবং অনেকটা কাছে যেতে পেরেছি, রাত-বিরাতে ঘরের বাইরে বেরোতে পেরেছি, পছন্দ না হলে প্রশ্ন করতে পেরেছি! অথচ মজার ব্যাপারটা হল, আমার বেড়ে ওঠার এই এতটা বছরে আমি যতজন সম চাহিদাসম্পন্ন বাংলাদেশীর সাথে মিশেছি, তারা সকলেই ছেলে। এই ঘটনাটা যতই সুড়সুড়ি দিক না কেন, এটা নিয়ে ভাবনার অনেক জায়গা রয়েছে। আমার মতে দুটো প্রধান প্রাথমিক কারণ রয়েছে ঃ

১। মেয়েদের উপর পাথরের মতো চেপে থাকা পুরুষতান্ত্রিকতা এবং গোঁড়া ধর্মীয় আচরণ বাংলাদেশে এতটাই প্রবল যে সেখানে মেয়েরা মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে কখনোই সেই সামর্থ্য অর্জন করতে পারে না যেখানে সে তার যৌন স্বাধীনতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারে বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে।

২। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরুষেরা অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। এই অধিক স্বাধীনতাই হয়তো সমপ্রেমী পুরুষদেরকে মেয়েদের চেয়ে আরও বেশি দৃশ্যমান করেছে, যেটা আর যাই হোক আমার চোখে অন্তত অসাধারণ লাগে।

তবে এটা ভাবার কোনো কারণই নেই যে, সমপ্রেমী পুরুষেরা অবাধ স্বাধীনতায় তাদের জীবনের সব পছন্দ বেছে নিতে পারছেন। তাদের জীবনকে কাম সর্বস্ব আর ভালোবাসাকে মানসিক বিকার বলে সমাজের চাপিয়ে দেয়া অপবাদের বোঝা দেখে মেয়েরা হয়তো আরোই গুটিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। যেখানে ছেলেরাই তাদের পরিবার কিংবা বন্ধুদের কাছেও নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পায় সেখানে সমপ্রেমের অধিকার কিংবা নিজের যৌন পরিচয়ের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনায় মেয়েদের অদৃশ্যমান থাকার ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

সমপ্রেমী আচরণ বাংলাদেশে যে কাউকে দশ বছরের জন্য জেলে পুরতে পারে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক কিংবা আইনি অধিকারই এখনো ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা পায়নি, সেখানে সমপ্রেম কিংবা তার চেয়েও সংবেদনশীল নারী সমপ্রেমের অধিকারের বিষয়টি কত দিনে সামনে প্রকাশ পাবে আমি জানি না। হয়তো কেবল ভিন্নতার প্রতি আরো সহনশীলতা কিংবা মানুষের প্রতি ভালোবাসাই পারে এই সামাজিক মনোবৈকল্যের অবসান ঘটাতে। সেদিন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন সম, অসম বা বিষম তকমা ছেড়ে আমরা সকলেই কেবল মানুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবো। এই সুদূরে বসেও আমি কেবল সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। ■

Scanned with
MOBILE SCANNER

অনাবৃত

নক্ষত্র ন্যায় রহস্যময় এক আলোকরশ্মি খেলা করে ওর চোখের মণিতে, এই আবছায়াতেও। সে আলোকরশ্মিতে আমি বারংবার আকৃষ্ট হই, মোহিত হই। যেমনটা উজ্জ্বল আলোর আঁধার পানে ধাবিত হয় কীটপতঙ্গ। সে আলোর ছোঁয়া পেতে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা হয় না তাদের। এ মুহূর্তে আলোকরশ্মিটা স্থির। সত্যিই কি কোন রহস্যময় নয়নজ্যোতি? নাকি কেবলই দ্বিতল দালানের জানালাটার পাশে উঁকি দেয়া স্ট্রিট লাইটের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি? গাঢ় আঁধারের কক্ষটাকে হালকা আলোর চাদরে ঢেকে রেখেছে যেটা। একই সাথে ওর চোখে ঢেলে দিচ্ছে নিরাভরণ মায়া। আমার চোখে সম্ভোগের পরিতৃপ্তির ছায়া। ক্ষুধার্ত আমি এখন শান্ত। কিন্তু ওর মুখমন্ডলে তৃপ্তির ছিটেফোঁটা দেখছি না। সেটা স্পষ্ট করে বোঝাতেই যেন জিজ্ঞেস করলো, 'ভালবাসতে পারো না?' কিছুটা তাচ্ছিল্য, কিছুটা আকাঙ্ক্ষা মেশানো জিজ্ঞাসা। আমাদের মিলন কক্ষটা যেমন আলো আঁধারের মিশেলে অপূর্ব পরিবেশ ধরে রেখেছে, ঠিক তেমনটা। কাম শান্ত করে আর ভালোবাসা করে অশান্ত। ওর মসৃণ চামড়া আটা করোটিতে চুম্বন এঁকে দিলাম আমার শুষ্ক ঠোঁট দিয়ে। এ চুম্বনে তৃপ্তির অভাব যেন, আরো আরো চুম্বন আঁকতে ইচ্ছে হয়। অথচ কিছুক্ষণ আগেও ভিন্নরকম অনুভূতি হচ্ছিল একই চুম্বনে! 'ওহ! তবে তুমি কি কাপুরুষ?' ওর মুচকি হাসিতে তাচ্ছিল্যের পরিমাণ বেড়ে গেল। কাপুরুষ! ঈষৎ লোমশ বুকের খাঁচায় বন্দী আমার সদ্য তৃপ্ত পৌরুষ ভীষণ গর্জে উঠলো যেন। সে গর্জন না টের পেল ও, না টের পেল আমাদের একমাত্র দর্শক স্ট্রিট লাইটটা। শূন্য তুরণবলের গর্জন আমার ভেতরে তৈরি হয়ে আমার ভেতরেই মরে গেল যেন। নাকি টের পেল স্ট্রিট লাইটটা? তাই কি কেঁপে উঠলো আলোটা? রাস্তার কুকুরটাও একটু কুঁইকুঁই শব্দ করে উঠলো মনে হল। নাহ! কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না। আলোর কেঁপে ওঠা? বিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তাদের খেলার অংশ হবে আরকি! রাস্তার কুকুরটা? সেও বোধকরি কোন পথচারীর লাথিগুঁতোর শিকার। আর ও? শুনলেও ভ্রুক্ষেপ করলো না! বরং আরো তাচ্ছিল্যভরে বললো, 'ভালোবাসার সাহস নেই তোমার।' 'ভালোবাসার সাহস, সে আবার কি?' প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'ওসব মেয়েদের ছেলে ভোলানো কথাবার্তা। আর তার সাথে যোগ দিয়েছো তোমরা।' অপমানে বিদ্ধ করে ওকে নিরায়ুধ করবার কৌশল হাতে নিল ক্ষিপ্ত পৌরুষ আমার। বিছানার একপাশে একটু সরে গেল ও, সেকেন্ড খানেক আমার দিকে তাকিয়ে অন্য পাশে ফিরলো।

বাকযুদ্ধে জয়ী হলাম বোধকরি। কাম ভালোবাসার অপ্রয়োজনীয় বাকযুদ্ধে ওর পরাজয় আমার পৌরুষকে শঙ্কা মুক্ত করে। স্বস্তি নিয়ে ওর উন্মুক্ত পিঠের দিকে তাকাই। চোখের মণির সেই রহস্যময় আলোকরশ্মি এখন পুরো পিঠ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে। বাদামী ত্বক আলো আঁধারিতে আমাকে বিভ্রান্ত করে। পুনরায় ক্ষুধার্ত করে তুলতে চায়। তবে এবার যেন ভিন্ন ক্ষুধা টের পাই। মেরুদণ্ডের জলহীন খাঁদে মুখ ডুবিয়ে কামহীন চুমুতে পূর্ণ করবার ক্ষুধা। সে আশার গুড়েবালি। যুদ্ধে ক্ষান্ত দেবার ইচ্ছে ওর নেই। মৃদুস্বরে তাই জিজ্ঞেস করলো, 'ভিঞ্চির মোনালিসা দেখেছো?'

'ভ্রুহীন বিচ্ছিরি ছবিটা?'

'বিচ্ছিরি বলছো? বলতেই পারো। ওসব ছবি টবি আঁকাও তো আমাদের ব্যপার। কিন্তু তাকে ঘিরে কত যে জল্পনা কল্পনা তা কি জানো?'

'আগ্রহ নেই।' এক কথায় রহস্য উড়িয়ে দিলাম।

এপাশ ফিরল ও, মুখে মৃদু হাসিটা। হাসিতে ভালোবাসার আলো, আবার কাম আঁধারের ছোঁয়া। আমি যেন গ্রিক পুরাণের সেই বহুমস্তক স্কিলা আর ঝঞ্ঝাময় ক্যারিবডিসের মাঝে আটকা পড়া জাহাজ। কোন দিকে গেলে জাহাজ ভেড়াতে পারবো স্বস্তিতে তার দিশে পাচ্ছি না। তাই আগ্রহ না থাকলেই বা কি। ফাঁদে আটকা পড়া পশুর মত শুনতে বাধ্য আমি এখন।

'মোনালিসা নাকি ভিঞ্চিরই প্রতিচ্ছবি। প্রথমে নিজের ছবি এঁকে পছন্দ হয়নি তার। সেটাকেই গড়ে মুছে তৈরি করেন মোনালিসা। সেই অর্ধপুরুষ, অর্ধনারীর হাসি নিয়েই কত কিছু! ভিঞ্চি ভাবতেন প্রত্যেক নারীর মাঝে পুরুষ স্বত্তা, আবার প্রত্যেক পুরুষের মাঝে নারীস্বত্ত্বা বিদ্যমান। যদি তা না থাকে তবে নাকি সে মানুষটি অসম্পূর্ণ।'

'তুমিও তাই বিশ্বাস করো নাকি?'

কামরূপধারী ভালোবাসার গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার চেষ্টা করি আরেকবার। 'আমার বিশ্বাসে কি এসে যায়!' হেঁয়ালিপনা কেবল, আর সেই মোহনীয় হাসি। স্কিলা তার বহু মাথা দিয়ে আরো বেশী ঘিরে ধরে আমাকে। ক্যারিবডিসের ঝড়ে আরো বেশী ঘুরপাক খেতে থাকে জাহাজ। আমি মুক্তি পেতে বলি, 'অনেক হল। আমি উঠি।' আহার অপূর্ণ থাকতেই উঠে পড়ি। যদি আবার অধিক ভোজন দেহ সইতে না পারে? 'এখনি?' ভাবলেশহীন ভাবে বলবার চেষ্টা করে ও, তবু জানি ভেতরে অশান্ত এখনো। ওর দিকে না তাকিয়েই বলি, 'এখনি।' তাতে কি আমার অশান্ত ভাব লুকোয়? ওর কাছে লুকোলেই বা লাভ কি, নিজের কাছে তো লুকোতে পারি না। কাম শান্ত করে বটে! ক্ষণিকের জন্যে!

বিঃদ্রঃ ভিঞ্চির কথাবার্তা গুলো অনেক আগে পড়েছিলাম। কিন্তু কোথায় মনে নেই। কথাগুলো সত্য নাও হতে পারে। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

উন্মেষে অভিজিৎ রায়

'সমকামিতা' বইটির ব্যাপারে কিছু বলুন। বইটি লেখার কথা মাথায় আসল কখন?

উত্তর: আসলে এ বিষয় নিয়ে বই লেখার ইচ্ছে আমার প্রথম থেকে ছিল না। আমি নিজে একজন বিজ্ঞান লেখক। বিজ্ঞানের টুকিটাকি বিষয় নিয়ে মুক্তমনা সাইটে বহু আগে থেকেই লিখতাম। সে সময় একটি ব্লগ-সাইটের পোস্টে একজন এ বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সমকামিতা প্রাকৃতিক কোনোভাবেই হতে পারে না, মূলত (নারী-পুরুষে) কামটাই প্রাকৃতিক'। বস্তুত এর উত্তর দিতে গিয়েই আমি এই বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ লেখা লিখি। তারপর ব্যাপারটাকে বিস্তৃত করতে গিয়ে আরো কয়েকটি পর্বের অবতারণা করতে হয়। লেখাগুলোর শিরোনাম ছিল–'সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ? একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা'। লেখাটা যে ব্যাপারগুলো রাষ্ট্রীয় মিডিয়াগুলোতে অনুপস্থিত ছিল, ঢেকে রাখা হয়েছিল অদৃশ্য কালো চাদরে, সেগুলোকেই এক ধরনের আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছিল ব্লগগুলোতে। বহু পাঠক আমাকে ই-মেইল করে জানিয়েছেন যে, সিরিজটি তাদের সমকামিতা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা আমূল বদলে দিতে সাহায্য করেছে। বই প্রকাশের ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছিল সে সময়ই, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম না, এই 'ট্যাবু টপিক' নিয়ে দেশের কোনো প্রকাশক বই প্রকাশ করতে সম্মত হবেন কিনা।

এই ব্যাপারটা সহজ করে দিলেন শুদ্ধস্বর প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুল। আমাকে ই-মেইল করে উনি নিজে থেকেই আমার কাছে একটি বিজ্ঞানের বইয়ের পাণ্ডুলিপি চাইলেন। আমি বললাম, পাণ্ডুলিপি একটা আছে বটে, কিন্তু একজন সাহসী প্রকাশক লাগবে। উনি বিনীতভাবে জানালেন, প্রকাশক হিসেবে তার সফলতা কতটুকু তা তিনি জানেন না, কিন্তু স্রোতের বিপরীতে বই ছাপানোর সাহস তাঁর আছে। উনি 'সমকামিতা' পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের জন্য মনোনীত করলেন এবং ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বইটি প্রকাশিত হল 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান' শিরোনামে। আর ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে বইটির দ্বিতীয় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ শুদ্ধস্বর থেকেই।

'সমকামিতা' না হয়ে নামটা কি 'সমগামী' কিংবা 'সমপ্রেমী' হতে পারতো?

উত্তর: 'সমগামী' কিংবা 'সমপ্রেমী' হতে পারতো কিনা সন্দেহ আছে তবে বইটির শিরোনাম 'সমপ্রেম' হতে হয়তো পারতো, কিন্তু যে বড়সড় ধাক্কাটা আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানসে দিতে চেয়েছিলাম বইটি প্রকাশের মাধ্যমে, সেটা আর হয়ে উঠত না। আমি জানি 'সমকামিতা' না হয়ে 'সমপ্রেম' হলেও বইটার বিষয়বস্তুর কোনো পরিবর্তন ঘটতো না; কিন্তু সমকামিতা শব্দটিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত সেটার বিপরীতে দৃঢ় পায়ে দাঁড়ানো হয়ে উঠত না। এই সামাজিক শৃঙ্খলটা ভাঙা দরকার ছিল।

তবে বইয়ের শিরোনামে সমপ্রেম স্থান না পেলেও বইয়ের ভিতরে অসংখ্য জায়গায় 'সমপ্রেম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া বইয়ের পরিশিষ্টে আলাদাভাবে সমপ্রেমকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে-

'সমপ্রেম হচ্ছে সমকামিতার আরেকটি প্রতিশব্দ। সমকামিতা শব্দটির মধ্যে কেবল কাম তথা কামনা, সম্ভোগ-প্রবৃত্তি এবং সম্ভোগ-লালসার ব্যাপারটিই মুখ্য হয়ে ওঠায় এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় সমপ্রেম প্রস্তাব করা হয়েছে। মূলত যৌনসম্পর্কের অভিলাষ ছাড়াও যেকোনো সমলৈঙ্গিক প্রেমজ সম্পর্ককে এই প্রতিশব্দের মাধ্যমে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে'।

বিষমকামী সমাজের চাপিয়ে দেয়া মানসিকতার পুনরাবৃত্তি ব্যাপারটা বাদ দিলেও এমনিতেই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। 'সমকাম' কিংবা 'সমকামী' শব্দগুলোতে যেন সমপ্রেমী যুগলের প্রেমের ব্যাপারটি উহ্য থেকে কেবল কামের তাড়নাই যেন মুখ্য হয়ে উঠে। কিন্তু পুরো বিষয়টা তো কেবল কামকে ঘিরে নয় বরং ব্যাপারটি তাদের একে অন্যকে ভালোবাসার অধিকারের। আজ খুঁজে দেখলাম, আমার বইয়ে অন্তত ষাট জায়গায় সমপ্রেম এবং সমকাম পরস্পর পরিবর্তনীয়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা করেছি উল্লিখিত মূল্যবান যুক্তিগুলো মাথায় রেখেই। কিন্তু তারপরেও শিরোনামের ব্যাপারটি নিয়ে যখন আলাদাভাবে ভেবেছি, তখন 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান'ই সবচেয়ে সঠিক শিরোনাম বলে মনে হয়েছে।

বইটি লেখার পর এর প্রভাব কিংবা প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছে বলে মনে করেন?

উত্তর: বইয়ের প্রথম প্রকাশের পর বইটির ভালো কিছু রিভিউ আমার নজরে পড়েছে। প্রথম আলো পত্রিকায় ২০১০ সালের আগস্ট মাসের ৬ তারিখে আলতাফ শাহনেওয়াজ 'অবগুণ্ঠন সরে গেল' নামের চমৎকার একটি শিরোনামে রিভিউ করেছেন বইটির। সমকামিতার মতো ব্যাপার যা এখনো আমাদের সমাজে 'অচ্ছুৎ' বলেই বিবেচিত, সে ধরনের বিষয় প্রথম আলোর মতো মূলধারার পত্রিকায় নিবন্ধিত হওয়া নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ এবং সেই সাথে প্রেরণাদায়ক। বইটির আরেকটি মূল্যবান এবং সুবিস্তৃত রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে সুসাহিত্যিক আহমদ মাযহার সম্পাদিত 'বইয়ের জগৎ' পত্রিকায়।

সরাসরি কিংবা সামনাসামনি কারো প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন?

উত্তর: গত বছর (২০১২) বইমেলা চলাকালীন সময়ের মধ্যে

একদিন মেলায় প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং গবেষক সেলিনা হোসেনের সাথে দেখা হল। উনি বললেন যে, আমার এই বইটি উনি আগাগোড়া পড়েছেন। বইটির ভূয়সী প্রশংসাও করলেন তখনই। তাঁর মতো স্বীকৃত একজন জেন্ডার গবেষক এই বইয়ের প্রশংসা করছেন, এটা আমাকে তাৎক্ষণিক লজ্জিত করলেও পরে বেশ ভালো লেগেছিল যার রেশটা আমার মধ্যে ছিল দেশ ছেড়ে চলে আসার পরেও অনেকদিন ...

কোনো বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হননি?

উত্তর: তা তো কিছু হবেই। তবে যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এসেছে অনেক কম।

অন্যরা কি বলছে?

উত্তর: এ ধরনের প্রতিক্রিয়া যা হয় আরকি! এক এমবিবিএস পাশ করা দাবিদার ব্লগার বলতে শুরু করলেন আমি নাকি সমকামী! যেন আমাকে সমকামী প্রমাণ করতে পারলে বইটির তথ্য মিথ্যে হয়ে যায়! এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে সমকামিতার অধিকার নিয়ে লেখা মানে নিজেও সমকামী হয়ে যাওয়া নয়। আমি বিজ্ঞান এবং মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। বইটিতে জীববৈচিত্র্যের স্বপক্ষে বিভিন্ন আধুনিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে, আমার জীবনের ঘটনা নয়। আমি মূলত একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই লিখতে চেয়েছি, আত্মজৈবনিক উপন্যাস নয়। বইয়ের বহু জায়গায়ই বলেছি আমি নিজে সমকামী নই, কিন্তু সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা বহু মানুষের এবং তাদের উপর নির্যাতনের ধারাবাহিক প্রতিফলনকেই আমি সন্নিবেশিত করেছি আমার লেখায়। এ জন্য আমার বহু প্রতিষ্ঠিত একাডেমিয়ান থেকে শুরু করে মানবাধিকার কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাংলাদেশে যারা জেন্ডার ইস্যু নিয়ে গবেষণা করেন তাদের অনেকেই নিজ থেকে সাহায্য করেছেন। কেউ হিজড়াদের অধিকার নিয়ে বই বের করলে, নিজেও হিজড়া হবেন এমন কোনো কথা নেই। কোনো সমাজ সচেতন লেখক যৌনকর্মীদের দুঃখ-বঞ্চনা এবং তাদের অধিকার নিয়ে লিখলে বা কথা বললে তাকেও যৌনকর্মী হতে হবে তা নয়। আমি সমকামী হলে সেটা বলতে আমার কোনো অসুবিধা ছিল না। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তা নই। হুমায়ুন আজাদ নারীদের নিয়ে 'নারী' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন, তা বলে তো হুমায়ুন আজাদ নারী হয়ে যাননি!

অনেকেই বলেন, 'বাংলাদেশে হাজারো সমস্যা। কিন্তু সব ছেড়ে আপনাকে সমকামিতা নিয়ে একটি বই লেখার দিকে যেতে হল কেন?'

উত্তর: প্রায় দু'হাজার পাঁচ শ বছর আগে সক্রেটিস নামের এক গ্রীক দার্শনিক উচ্চারণ করেছিলেন- 'I am not a citizen of Greece or Athens; I am a citizen of the world.' আমিও নিজেকে সারা বিশ্বের বাসিন্দা হিসেবে দেখতেই পছন্দ করি, তা আমি যেখানেই বসবাস করি না কেন। সেজন্যই বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করার ক্ষুদ্র 'অপচেষ্টা'।

আর আমার চোখে এই গুরুত্বের বিষয়টা একেবারেই আপেক্ষিক। যে ইস্যুগুলোকে 'সমকামীদের বেদনার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে অনেকেই কাজ করছেন, অতীতেও করেছেন ভবিষ্যতেও করবেন। যারা এই ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করছেন তাদের প্রতি আমার সব সময়ই পূর্ণ সমর্থন থাকে এবং থাকবে। বিভিন্ন নিরপেক্ষ গবেষণায় আমাদের দেশে ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন সমকামী এবং রূপান্তরকামী জনগণের অস্তিত্বের কথা উঠে এসেছে। অথচ তাদের অস্তিত্বই সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে অস্বীকৃত। তারা দেশের 'অদৃশ্য সংখ্যালঘু'। আমি আমার বইয়ে দেখিয়েছি, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ নারী অধিকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কিংবা বড়জোর পাহাড়ি কিংবা আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে আজ কিছুটা সচেতনতা দেখালেও তারা এখনো যৌনতার স্বাধীনতা কিংবা সমকামীদের অধিকার নিয়ে একদমই ভাবিত নয়। খোদ ইরানেই ১৯৭৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০০ ব্যক্তিকে সমকামিতার অজুহাতে হত্যা করে হয়েছে। এর মধ্যে একটি ঘটনা সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। ইরানে বছর কয়েক আগে (২০০৫ সালে) দুজন কিশোরকে সমকামিতার অপরাধে ফাঁসি দেয়া হয় তারপর সেই লাশ শহরের রাস্তায় ট্রাকে করে ঘোরানো হয়। তালিবান নিয়ন্ত্রিত সময়কার আফগানিস্তানে ১৯৯৮ সালে কান্দাহারে তিনজন পুরুষকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে হত্যা করা হয়। তাদের অপরাধ ছিল সমকামিতা। ২০০৯ সালে ইরাকে গুপ্ত হত্যায় সাত মাসে ৮২ জন সমকামী প্রাণ হারায়। সমকামিতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন নৃশংসতার ঘটনা মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, সুদান, বাংলাদেশসহ প্রায় প্রতিটি মুসলিম প্রধান দেশে অহরহই ঘটছে। ইরাকে সমকামীদের এভাবে রাস্তায় পিটিয়ে মারা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এমনকি খোদ আমেরিকাতেই ওয়াইয়োমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ম্যাথু শেফার্ডকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সারা বিশ্বে ঘটা সহিংসতার প্রায় আঠারো ভাগ যৌনপ্রবৃত্তি কিংবা যৌন পরিচয়কে লক্ষ্যবস্তু করে সংগঠিত হয়, তা সময় সময় বিভিন্ন পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে।

আমি ঠিক জানি না যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তাদের মনে পরিসংখ্যানগুলো কোনো রেখাপাত করে কিনা, আমার কিন্তু যথেষ্টই করে। শুধু ভিন্ন যৌন প্রবৃত্তি থাকার কারণেই রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং সামাজিকভাবে সমকামীদের উপর যে লাগাতার অত্যাচার চলেছে তা আসলে রূপকথাকেও হার মানায়।

এছাড়া পাশাপাশি আছে

আত্মহননের ঘটনা। আমি ছেলেবেলায় যে এলাকাতে বড় হয়েছি,

সেখানে একটি ছেলে ছিল, আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড়। ছেলেটিকে এলাকায় 'একটু মেয়েলী' বলে খোঁটা দেয়া হত। ছেলেটি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাথে থাকতে এবং তাদের সাথে খেলাধুলা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি ছেলেটি গলায় দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আমরা চক্ষু মুদে থেকে এ ঘটনাগুলোকে যতোই অস্বীকার করার চেষ্টা করি না কেন, এগুলো কিন্তু ঘটছেই। অন্যান্যরা না হয় অনেক বেশি প্রয়োজনীয় নয়তো অন্য অনেক ব্যাপার নিয়ে লিখুন, কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে কেবল ঢাকাই পড়ে না থাকে, সেজন্যই আমার এবারকার ছোট প্রচেষ্টা।

সমকামিতা আমাদের সংস্কৃতিতে নেই, এ কেবলই পশ্চিমা ব্যাধি বলে যারা চালাতে চায়, তাদের কি বলবেন?

উত্তরঃ আমি দ্বিমত করব। আমাদের সংস্কৃতিতে যে সমকামিতা সব সময়ই ছিল ইতিহাস থেকে তার অজস্র উদাহরণ পাই আমরা। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে সমকামিতার উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারটা কেবল 'পশ্চিমা ব্যাধি' হলে প্রাচীন সাহিত্য কিংবা পুরাণগুলোতে এর উল্লেখ থাকত না। সমকামিতার ইতিহাস আসলে অনেক পুরনো। প্রাচীন গ্রিসের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে সমকামিতার স্পৃহার কথা জানা যায়। ধর্মীয়ভাবে সমপ্রেম সেখানে স্বীকৃত ছিল। 'ভেনাস' ছিলেন তাদের কামনার দেবী। এই দেবীই আবার সমকামীদের উপাস্য ছিলেন। এছাড়া 'প্রিয়াপ্রাস' নামে আরেক দেবীকেও সমকামীরা আরাধনা করত বলে শোনা যায়।

তাহিতির বিভিন্ন জায়গায় সমকামে আসক্ত ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতার মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। আনাতেলিয়া, গ্রিস এবং রোমার বিভিন্ন মন্দিরে 'সিবিলি' এবং 'ডাইওনিসস'-এর পূজা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। সিবিলির পুরোহিতেরা গালি নামে পরিচিত ছিলেন। এরা নারীবেশ ধারণ করতেন। মাথায় নারীর মতো দীর্ঘ কেশ রাখতে পছন্দ করতেন। এরা সমকামী ছিলেন বলেও অনুমিত হয়। পরে এশিয়া মাইনর থেকে সিবিলি পূজা পারস্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এ সমস্ত প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়।

পারস্য সাহিত্যে অনেক কবি তাদের প্রেমিকাকে পুরুষ নামে ডাকতেন। তবে এটি সম্ভবত অঞ্চলভিত্তিক কোনো প্রথা। আরব সমাজে বয়স্ক পুরুষ এবং বালকের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য তো বটেই, মধ্যযুগে (ইসলামের বিস্তৃতির সময়) বহুল প্রচলিতও ছিল। 'সাকী' বলতে এখন আমাদের চোখের সামনে সুরাপাত্র হাতে যে মোহনীয় লাস্যময়ী নারীর ছবি ভেসে উঠে, প্রাচীন আরবে তা বোঝানো হত না। গবেষকরা বলেন, 'সাকী' বলতে আরবে নারীর পাশাপাশি সুদর্শন কিশোরও বোঝানো হত। তারা শুধু পানপাত্রে দ্রাক্ষারসই পরিবেশন করত না, পাশাপাশি অন্যান্য পার্থিব সেবাও পরিবেশন করত। এর উল্লেখ পাওয়া যায় আরবের বহু সমকামী কবিদের রচনায়।

> আমরা সমকামীদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার কথা বলছি। সমকামিতা, বিষমকামিতা, উভকামিতা কোন কিছুতেই উৎসাহিত কিংবা নিরুৎসাহিত করছি না। এই সুন্দর পৃথিবীতে যে যার মত অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে সেটাই প্রত্যাশা হওয়া উচিৎ

কিন্তু ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও তো প্রশ্ন আছে?

উত্তরঃ ইসলামে সমকামিতাকে হারাম বলে ঢালাওভাবে প্রচার করা হয়, কিন্তু উর্দু এবং ফার্সি ভাষায় লেখা রচনা খুলে দেখুন! সমকামিতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাবেন। সমকামিতার উল্লেখ রয়েছে ইতিহাসের বহু মুসলিম কবিদের রচনাতেই। যেমন- আমীর খসরু, জিয়াউদ্দিয়া রায়ানি, জামশেদ রাজগিরি, মুশ্রিখি, হাকিকাত-আল-ফুকারা, মুহম্মদ আকরাম, সিরাজ আব্দুল হাই, দরগাহ কুয়ালি খান, মীর তাকি, ইফতি নাসিম প্রমুখ। ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামলে দিল্লিতে সমপ্রেমিকদের রাজদরবারে অবাধ গতিতে আসা-যাওয়ার কথাও ইতিহাসে আমরা পাই। সমান্তরাল যৌনতা এ সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে কবি মুকাররম বক্স ও মোক্কারোমের প্রসঙ্গ। কবির মৃত্যুর পর ৪০ দিন তার প্রেমিক শোক যাপন করেছিলেন, বিধবার মতো। আর সুফিদের ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি অবগত। তাদের আধ্যাত্মিক গান ও সাহিত্য স্বর্ণ-স্তবক হয়ে আছে। এ ধরনের বহু উদাহরণই দেওয়া যায়।

পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম এবং পুরাণ থেকেও কিছু উদাহরণের উল্লেখ করা যাক। সগরবংশীয় অংশুমানের পুত্র মহারাজা দিলীপ নিঃসন্তান হয়ে মৃত্যুবরণ করলে জন্ম-রক্ষায় সমস্যা দেখা দেয়। শিব সে সময় আবির্ভূত হয়ে রাজার দুজন বিধবা স্ত্রীকে আদেশ করেন সন্তান লাভের জন্য পরস্পর দেহ-মিলন করতে। তাদের মিলনে সন্তান জন্মায় বটে কিন্তু সে সন্তান ছিল অস্থিহীন। পরে ঋষি অষ্টাবক্রের বলে সেই সন্তান সুস্থ এবং উত্তমাঙ্গ হন এবং ভগীরথ নামে রাজ্যশাসন করেন। রাম ও সুগ্রীব তাদের বন্ধুত্ব সুগভীর করার উদ্দেশে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করে সাত-চক্কর দিয়েছিলেন, তার বর্ণনাও আছে।

এমনকি নর-নারীর 'শারীরিক' মিলন ছাড়াও সন্তান জন্ম নেওয়ার উপকথার সন্ধান মিলে রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো বৈদিক সাহিত্যগুলোতে। এসব কাহিনিতে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের জন্মের ক্ষেত্রে কখনও-সখনও সমকামিতারও আভাস মেলে।

নারী সমকামিতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে রামায়ণে। লঙ্কা পরিভ্রমণের সময় হনুমান রাবণের স্ত্রীগণের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থা চাক্ষুষ দেখেছিলেন। সমকামিতার উল্লেখ ছাড়াও বৈদিক সাহিত্যে আমরা পাই লিঙ্গ-পরিবর্তনের কাহিনী। বিষ্ণুর মোহিনী অবতাররূপে ধরাধামে এসে শিবকে আকর্ষিত করার কাহিনি এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহাভারতের শিখণ্ডী ও বৃহন্নলার কাহিনিও বোধ হয় সবারই জানা। এছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্য (বিমলাকৃতি নির্দেশ), জৈন সাহিত্য এবং অন্যান্য সাহিত্যগুলোতেও সমকামিতার অজস্র উপকরণ পাওয়া যাবে। শুধু ধর্মীয় পুরাণ কিংবা গ্রন্থেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও সমকামিতার প্রচুর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

আসলে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সমকামিতা সব সময়ই মানবসমাজে ছিল। গ্রিক, রোমান, চৈনিক, পাপুয়া নিউগিনি অথবা উত্তর আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতায় সমকামিতার অজস্র উদাহরণ আছে। সমকামিতা ছিল আজটেক ও মায়া সভ্যতায়। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশেষ শাখা আছে। এরা এক সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের ভজনা করে থাকে। এদের অনেকে স্ত্রীবেশ ধারণ

করে। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম সাধক গদাধর গোস্বামী নাম নিয়েছিলেন রাধিকা। আবার গোবিন্দ ঘোষ রঙ্গদেবী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।
মূল কথা হচ্ছে, সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা- এগুলো কোনোটাই আধুনিক পশ্চিমাদের আবিষ্কার কিংবা বিকৃতি নয় বরং এটি প্রাচীন সভ্যতা থেকে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই ছিল; পত্রপত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেটের কারণে ব্যাপারগুলো সামনে চলে এসেছে।

অনেকেই ধর্মীয় কাহিনির উল্লেখ করে বলেন সমকামিতার জন্য দুটো নগরী ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। কাজেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?

উত্তর: এটার উত্তর আমাকে অসংখ্যবার দিতে হয়েছে। প্রথমত আমার লেখাটা বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণের উপর লিখিত, কোনো ধর্মীয় উপকথার নয়। হ্যাঁ, সমকামিতার কারণে সডোম এবং গোমরাহ ধ্বংসের কাহিনী আমরা বাইবেলে পাই এবং পরবর্তী ধর্মগুলো সেই উপাখ্যান ঘিরেই আবর্তিত। আমার মতে এটা কেবল বাইবেলীয় উপাখ্যান, এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। আর সত্য বলে যদি ধরেও নেই, বহু বিশেষজ্ঞই মত দিয়েছেন সমকামিতার কারণেই নগরী দুটো ধ্বংস হয়েছিল তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ কোথাও নেই বরং সেটা হয় তাদের লোভ, লালসা আর ধর্ষকামী মনোভাবের জন্য। আপনি জন বসওয়েল-এর 'Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality' গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করি বাইবেল থেকেই। বাইবেলে বর্ণিত গিবূয় (Gibeah) নগরীও একইভাবে অথিতিবৎসল না হওয়া এবং ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর এক সময় পুরো নগর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন (Judges 19:22-30)। সেখানে গৃহকর্তার দাসী এবং উপপত্নীকে সারা রাত ধরে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সমকামিতাকে সেক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও নগর রক্ষা পায়নি। কাজেই উদারপন্থী ধর্মতাত্ত্বিকেরা দাবি করেন, সডোমের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি এসেছে ধর্ষকামিতার কারণে, সমকামিতার কারণে নয়। আর সত্যি বলতে ধর্মে কিছু আছে বলেই সবকিছু অক্ষরে অক্ষরে পালন কি করি আমরা?

> “বহু বিশেষজ্ঞই মত দিয়েছেন সমকামিতার কারণেই নগরী দুটো ধ্বংস হয়েছিল তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ কোথাও নেই”

সমকামী অধিকার সমর্থন করলে সবাই সমকামী প্রবণতাকে উৎসাহিত করা হবে বলে অনেক ধারণা করেন, এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

উত্তর: এটা একেবারেই ভুল ধারণা। আমরা সমকামীদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার কথা বলছি। সমকামিতা, বিষমকামিতা, উভকামিতা কোনো কিছুতেই উৎসাহিত কিংবা নিরুৎসাহিত করছি না। আর এখানে উৎসাহিত করারও তো কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের যৌন প্রবৃত্তি জৈবিকভাবে অঙ্কুরিত এবং সেটা তৈরি হয় অনেক ছোটবেলা থেকেই। যে ছেলেটির মধ্যে সেই ছোটবেলা থেকেই বিপরীত-লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, তাকে কি কেউ চাইলেই সমকামী বানিয়ে দিতে পারে? সেটার দরকারও নেই। এই সুন্দর পৃথিবীতে যে যার মতো অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে সেটাই প্রত্যাশা হওয়া উচিত। সমকামীরা দুনিয়াশুদ্ধ সবাইকে সমকামী বনে যেতে কখনোই বলেনি। যখন কালো মানুষদের সমানাধিকার মেনে নেয়া হয়েছিল তখন সব সাদা চামড়ার মানুষেরা দল বেঁধে কালো হয়ে যায়নি। সাদারা সাদাদের জায়গায় আছে, কালোরা কালোদের জায়গায়। কেবল তাদের আইনি এবং সামাজিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বজুড়ে। এই যে বাংলাদেশে 'হিজড়া'-দের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তা বলে কি নারী-পুরুষ সবাই দল বেঁধে 'হিজড়া' হয়ে যাচ্ছে? সমকামীদের অধিকার দেওয়া হলে সবাই সমকামী হওয়া শুরু করবে, কিংবা এর মাধ্যমে সমকামী প্রবণতাকে উৎসাহিত করা হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

'সমকামভীতি' শব্দটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? আসলেই কি মানুষ সমকামীদের ভয় করে নাকি উলটো ভয় দেখায়?

উত্তর: আসলে 'সমকামভীতি' বা 'হোমোফোবিয়া'কে আমি যেভাবে দেখি তা হল, সমকামীদের প্রতি সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সাংগঠনিকভাবে ঘৃণা ছড়ানোর প্রবণতাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের একটা অংশ সমকামিতাকে দেখতে চেয়েছে মনোবিকার, মনোবৈকল্য বা বিকৃতি হিসেবে। সমকামীদের অচ্ছুৎ বানিয়ে এদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তো আছেই, কখনো এদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহননের পথে। কখনো বা স্রেফ সমকামী হবার কারণে করা হয়েছে হত্যা। আমি আপনার সাথে একেবারেই একমত, এখানে সমকামীদের ভয় করার ব্যাপারটা যতটা না আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সাংগঠনিকভাবে ভয় দেখিয়ে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা।

সামাজিক পরিবর্তনের চেষ্টা আগে হওয়া উচিত নাকি আইনগত দিকেও এখন চোখ ফেরানোর সময় এসেছে?

উত্তর: আমার মতে এ দুটো ব্যাপার 'মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ' কিছু নয়; বরং এক সাথেই চলতে পারে। মন মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য লেখালেখি, সভা সেমিনার করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মান্ধাতার আমলের আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার মতো সাহসী মানুষের। অনেকেই হয়ত জানেন, বাংলাদেশের সংবিধানের পেনাল কোডের ৩৭৭ ধারায় সমকামিতাকে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই পেনাল কোডের ৩৭৭ নং অনুচ্ছেদটি সংবিধানের মূলনীতি- 'সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার' (Part II Article 19) এবং 'সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন' (Part III Article 27)-এর পরিষ্কার লঙ্ঘন। শুধু তাই নয় আজকের পৃথিবীর বিশ্ব মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চরম অন্যায়। বাংলাদেশকে মানবাধিকারের প্রতি সংবেদনশীল আধুনিক একটি দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে আন্তর্জাতিক আইনকানুন এবং রীতি নীতির প্রতি উদাসীন হয়ে থাকলে চলবে না।

কোনো পরিবর্তন কি আশা করেন বাংলাদেশে?

উত্তর: আমি আশাবাদী। একটা সময় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় এ নিয়ে আলোচনার কোনো প্রেক্ষাপটই ছিল না। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। ফেসবুক, ব্লগ কিংবা টুইটারে মানুষ আলোচনা করছে। রাষ্ট্র চাইলেও সবার কণ্ঠরোধ করতে পারছে না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মেইনস্ট্রিম পত্রিকাগুলোর কয়েকটি এ ব্যাপারে লেখা ছাপাতে আগ্রহী হচ্ছেন, সেটাও দেখছি। আমি আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তন আসবেই। ■

সান্নিধ্যে শয়ন

প্রিয়জনের সান্নিধ্যে চিরনিদ্রায় শয়নের সাধ কার না থাকে? এখনো আমাদের অনেকের পারিবারিক কবরস্থানে গেলে দাদীর কবরের অবস্থানটা দেখা যায় দাদার পাশেই। হয়তো কারো কারো মা-বাবা ওসিয়ত করে যান দুজনের কবরটা পাশাপাশি রাখতে। এভাবেই প্রিয় মানুষটার পাশে মৃত্যুর পরেও থাকার অভিলাষটা আমাদের চিরন্তন। তবে সবার এই সাধ কিন্তু পূরণ হয় না। আর সেখানে প্রিয় মানুষটা যদি হয় সমলিঙ্গের, তাহলে তো কথাই নেই!

সমপ্রেম যে সর্বকালীন সে কথা আজ আর কারো অজানা নয়। এখনকার মতো সমপ্রেমীদের ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের সুযোগ বা অধিকার আদায়ের সোচ্চার দাবি মধ্যযুগে হয়তো ছিল না, কিন্তু সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ঠিকই ছিল। ইতিহাসের পাতায় এর অনেক কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যায় না, কেননা ইতিহাস সমাজের সৃষ্টি আর কোনোকালেই কোনো সমাজ সমপ্রেমকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস হয়েছে বিকৃত, সমপ্রেমী যুগলের ভালোবাসার অমর গাঁথা তাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই হয়ে গেছে দাফন।

> কিন্তু ইতিহাসের মুখে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আজও সগৌরবে পাশাপাশি রাখা তাদের কবর দুটি প্রমাণ বহন করছে কামালির অস্তিত্বের।

কিন্তু দুটি সমপ্রেমী যুগলের চিরনিদ্রায় সান্নিধ্য শয়ন আঙ্গুল তুলেছে ইতিহাসের দিকে। প্রমাণ করেছে সমপ্রেম ছিল, আছে আর থাকবে। আর এই অসাধ্য সাধন করে গেছেন যে দুটি সমপ্রেমী জুটি তারা হলেন জামালি-কামালি এবং শাহ্ হুসাইন-মধু লাল।

জামালি নামটা বিখ্যাত সূফি সাধক ও কবি শেখ ফজলুল্লাহ্ ওরফে জালাল খানের উপনাম। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী তার জীবনকাল সিকান্দার লোদী ও হুমায়ুনের শাসনামলে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, ইতিহাস তার বুকে স্থান দেয়নি কামালির নাম। কিন্তু ইতিহাসের মুখে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আজও সগৌরবে পাশাপাশি রাখা তাদের কবর দুটি প্রমাণ বহন করছে কামালির অস্তিত্বের। মধ্যযুগে সমপ্রেম এখনকার মতো কালো পর্দায় আবৃত কোনো বিষয় ছিল না। দারাঘ কুলি খানের লেখা 'মুরাক্কা-ই-দিল্লি'-তে ১৭৪০-এর দিকে সমপ্রেমের বিষয়টা দিল্লির সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। আর তাই মধ্যযুগে সমপ্রেমের গ্রহণযোগ্যতার আলোকে বলা যায় কামালি জামালির ভালোবাসার মানুষই ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে ভিন্নমতও যে নেই তা নয়। জাকির হোসেন কলেজের উর্দু সাহিত্যের শিক্ষক খালিদ আলাভির মতে, 'সূফি সাধক ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে ভালোবাসা ছিল, কিন্তু তাকে প্রচলিত অর্থে সমপ্রেমের আখ্যা দেয়া যায় না, কারণ তাদের সম্পর্ক শরীরকে ছাপিয়ে আত্মার উন্নতি সাধনে নিয়োজিত ছিল।' একই মত পোষণকারী দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মধ্যযুগের ইতিহাস' বিষয়ের শিক্ষক নাদিম শাহ্-এর মতে, 'আমরা বলছি না যে সমপ্রেম খারাপ এবং সূফিবাদের প্রেক্ষাপটে সমপ্রেমের বিষয়টা অগ্রাহ্য করার মতো; কিন্তু সত্য কথা হল এই ব্যাপারে আমাদের কাছে লিখিত কোনো দলিল নেই। তাই প্রমাণ ছাড়া পীর-মুরিদের মাঝে বিদ্যমান গভীর ও আবেগঘন সম্পর্ককে রঙিন চশমায় দেখে সমপ্রেম আখ্যা দেয়া নিতান্তই বাতুলতা।'

ইতিহাস সাক্ষ্য চায়, যা আমাদের কাছে ঐ অর্থে নেই। নেই কেননা ইতিহাস সমাজের সৃষ্টি, আর কোনো সমাজ কখনোই সেভাবে সমপ্রেমকে স্বীকৃতি দেয়নি। এখানে বিজ্ঞ ইতিহাসবেত্তাগণ সমপ্রেমকে সমকামের সাথে গুলিয়ে ফেলেন প্রায়শই। আমাদের উদ্দেশ্য পীর-মুরিদের মাঝে বিদ্যমান ভালোবাসাকে প্রমাণ করা, যার অস্তিত্ব ইতিহাসবেত্তাগণ নির্দ্বিধায় স্বীকার করে ফেলেছেন তাদের কথায়। তাদের মাঝে সমকামের সম্পর্ক ছিল সে কথা আমরা বলছি না, তবে সমপ্রেম যে ছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করছে জামালির কবরের পাশে কামালির কবর। একটা প্রশ্নই শুধু রেখে যাচ্ছি ইতিহাসবেত্তাদের নিকট। বিখ্যাত সূফি সাধক শেখ ফজলুল্লাহ্ ওরফে জামালির তো অনেক মুরিদই ছিল, তাহলে কেন বেছে বেছে কামালির কবরটাই তার পীরের পাশে করা হল? তবে আনন্দের কথা হল এই প্রেমিক যুগলের প্রেমকাহিনীকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে গেছেন ক্যারেন চেজ। এই মহিলা তার লেখা 'Jamali-Kamali: A tale of passion in Mughal India (২০১১)' বইয়ে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনির ভিত্তিতে

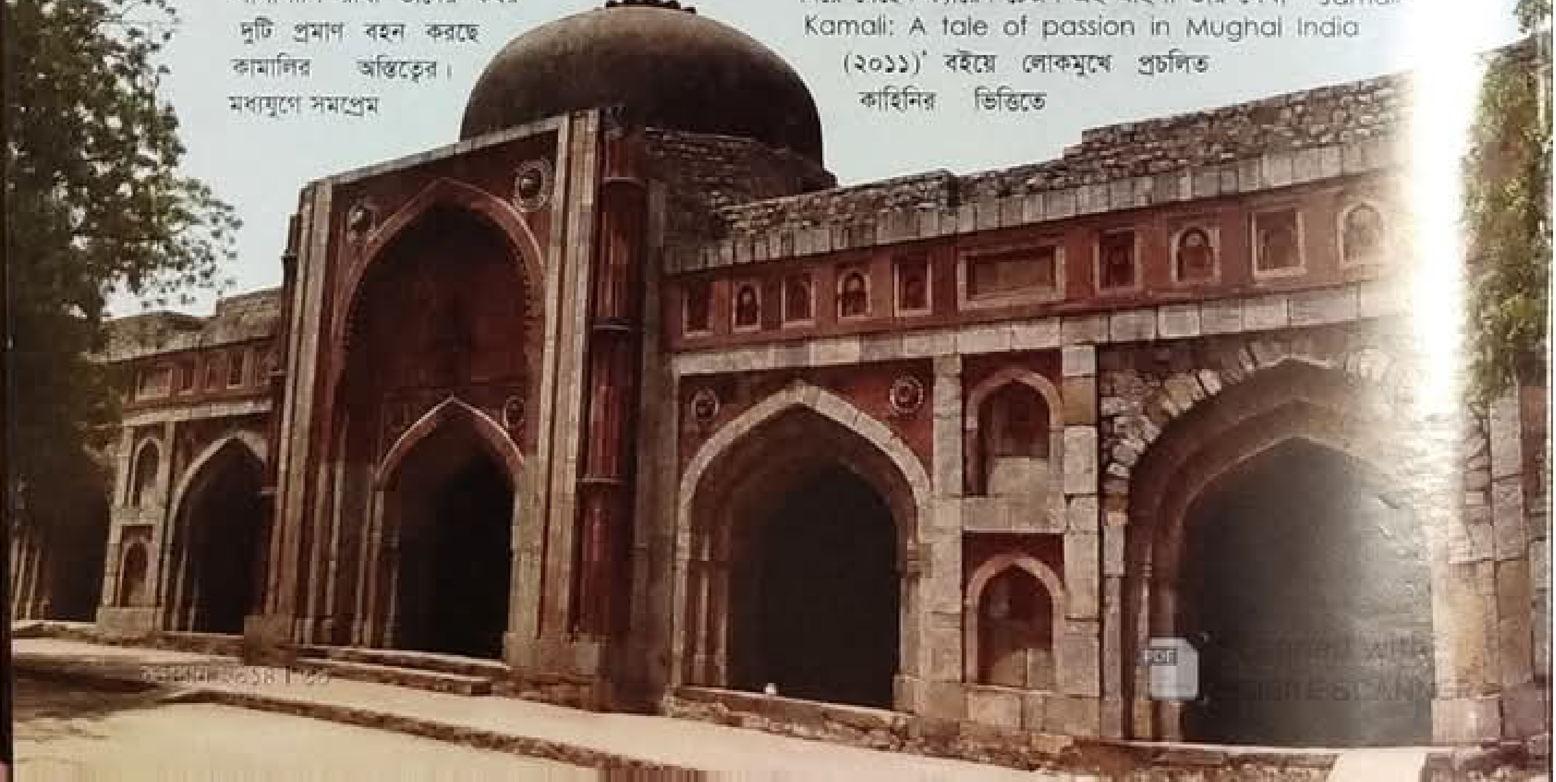

নতুন করে লিখেছেন জামালি-কামালির ভালোবাসার কথা।

এবার আসি আরেক যুগলের কথায়, শাহ্ হুসাইন-মধু লাল। লাহোরের বাসিন্দা হযরত শাহ্ হুসাইন (১৫৩৮-১৫৯৯) তথা মধু লাল হুসাইনের জীবনকাল আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনামলে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুফি সাধক বাহলুল শাহ্ দারিয়াই-এর অনুসারী। তার মা ছিলেন ধান্ধা গোত্রের এক রাজপুত মহিলা এবং তার পূর্বপুরুষ কালসারাই নামে পরিচিত ছিল। তাই শাহ্ হুসাইনের প্রকৃত নাম ছিল ধান্ধা হুসাইন কালসারাই। পরবর্তীতে কিভাবে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে মধুলাল হুসাইন হয়, সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এখন আসি মধুর কথায়। মধু ছিল এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পুত্রের নাম। বিখ্যাত এই সুফি সাধকের সাথে মধুর সাক্ষাতের ব্যাপারটা অনেকটা নাটক-সিনেমার মতো। লাহোরের অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী মধু একদিন হেঁটে যাচ্ছিল পথ দিয়ে। হঠাৎ তাকে দেখে এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেন শাহ্ হুসাইন। যাকে বলে একদম প্রথম দেখায় ভালোবাসা! পিছু নিলেন, চিনে আসলেন মধুর বাড়ি। মধুর

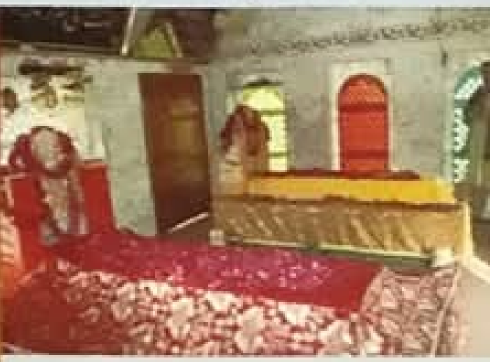

প্রতি তিনি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত শাহ্ হুসাইনের। পাগলের মতো ছুটে যেতেন মধুর বাড়িতে। প্রিয় মানুষটার বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতেন, আর চাইতেন মধুর মুখটা একবার দেখতে। এভাবে নিজের বাড়ির চারপাশে এই সুফি সাধককে প্রায় প্রতিদিন ঘুরতে দেখে মধুর মনেও কৌতূহলের উদ্রেক হয়, সেও ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে শাহ্ হুসাইনের প্রতি। শাহ্ হুসাইনের প্রেমে আসক্ত হয়ে মধুও এবার তার বাড়ি যেতে শুরু করে প্রতিদিন। সেই থেকে এক হিন্দু ছেলের সাথে মুসলিম দরবেশের মেলামেশাটা শহরে আলোচনার ঝড় তোলে। মধুর বাবা-মা ছেলের এই অবাধ মেলামেশা বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

শাহ্ হুসাইনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও মধু কিন্তু তখনো হিন্দু ধর্ম ছাড়েনি। লোকমুখে শোনা যায়, এক আধ্যাত্মিক ঘটনা মধু ও তার বাবা-মাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ঘটনাটা অনেকটা এরকমঃ

একবার মধুর বাবা-মা হরিদ্বারে পুণ্যস্নানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা মধুকেও সাথে নিতে চান। কিন্তু শাহ্ হুসাইন মধুকে তার বাবা-মার সাথে যেতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কেননা মধুর সান্নিধ্য তিনি মুহূর্তের জন্যও হারাতে চাইতেন না। তবে মধুর বাবা-মাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, পরে তিনি মধুকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে দেবেন। আশাহত হয়ে মধুর বাবা-মা তাকে ছাড়াই হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এর মধ্যে পেরিয়ে যায় কয়েকদিন, মধুর বাবা-মা পৌঁছে যান হরিদ্বার। এদিকে বাবা-মাকে অনেকদিন দেখতে না পেয়ে কিশোর মধুর মন উতলা হয়ে ওঠে। শাহ্ হুসাইন ব্যাপারটা আঁচ করতে পারেন। একদিন তিনি মধুকে বলেন, চোখ বন্ধ করতে, সাথে এ-ও বলে দেন মধু যেন মাটিতে পা পড়ার আগ পর্যন্ত চোখ না খুলে। কথা মতো চোখ বন্ধ করার পর মধুর পা যখন মাটিতে পড়লো, চোখ খুলে দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে তার বাবা-মা। আর সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা মোটেই লাহোর নয়, লাহোর থেকে হাজার মাইল দূরের স্থান- হরিদ্বার। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ মধু ও তার বাবা-মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং লাহোরে পৌঁছে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মধু হয়ে যায় শাহ্ হুসাইনের একনিষ্ঠ অনুসারী।

শাহ্ হুসাইনও কম যান না। যে মানুষটা তার জন্য ধর্ম পরিবর্তন করল, তার জন্য তিনি নিজের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের এই সম্পর্ককে অমর করে রাখতে তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন মধুলাল হুসাইন। যেন পীর আর মুরিদ ভিন্ন কোনো সত্তা নয়, দুই দেহ এক আত্মার একই সত্তা।

মধুলাল হুসাইন মৃত্যুবরণ করেন ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, ৬৩ বছর বয়সে। মধু তখন মধ্যবয়সী যুবক। মধুলাল হুসাইনের মৃত্যুর পর আরো ৪৮ বছর বেঁচে ছিলেন মধু এবং অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তার কবরটিও করা হয় মধুলাল হুসাইনের পাশেই।

এভাবেই জামালি-কামালি এবং শাহ্ হুসাইন-মধুলাল যুগলদ্বয় একে অপরের সান্নিধ্যে চিরনিদ্রায় শয়নের মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন সত্যিকার ভালোবাসা অমর করে রাখা দুঃসাধ্য কোনো কাজ নয়। ■

ছবি: ইন্টারনেট

Scanned with MOBILE SCANNER

সার্ফিং সমাচার

চল্লিশজন ছেলে আর দশজন মেয়ে নিয়ে 'কক্সবাজার লাইফ সেভিং এন্ড সার্ফিং ক্লাব' এখন কক্সবাজারের বেশ বড় একটি সার্ফিং পরিবারের নাম। 'সার্ফিং' কিংবা 'লাইফ গার্ডিং'-এর মতো বিষয়গুলি বাংলাদেশী সমুদ্রতটে এখনো ততোটা পরিচিত না হলেও বিশ্বব্যাপী এর চর্চা রয়েছে। গত তিন বছর ধরে গড়ে ওঠা এই ক্লাবে কক্সবাজারের স্থানীয় ছেলে-মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবামূলক নানারকমের কাজ করে যাচ্ছে। ক্লাব ঘরে সার্ফিং বোর্ড বানানো থেকে শুরু করে সার্ফিং-এর ট্রেইনিং কিংবা নানান কৌশল নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে।

সার্ফিং বোর্ড নিয়ে খুব বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, যেখানে ১০-১২ ফুটের মতো উঁচু ঢেউ এসে ভাঙে, সেখানটায় সার্ফিং সবচেয়ে ভালো হয় বলে রূপবানকে জানালেন বিগত দশ বছর ধরে সার্ফিং করে আসা কামরুল। সাধারণত ভোরবেলা ছেলেরা এবং বিকাল পাঁচটার পর মেয়েরা সার্ফিং করে থাকে। যেসমস্ত দেশি-বিদেশি পর্যটক কক্সবাজারে ঘুরতে আসেন, তাদেরকে সার্ফিং শেখানো কিংবা পানিতে 'সার্ফিং বোট' সহকারে নিয়ে যাওয়ার কাজগুলোও তিনি করেছেন অনেকবার।

তবে সার্ফিং এর পাশাপাশি এই ক্লাবটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি এখন করছে, সেটা হলো জীবন সুরক্ষা/লাইফ গার্ডিং। 'এই গত দুইদিন আগেই আমরা ছয় বছরের একটা বাচ্চাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচালাম', জানাচ্ছিলেন কামরুল। সার্ফিং এর পাশাপাশি মানুষের জীবন রক্ষাকারী এই কাজ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কামরুলের গলার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস আমাদের নজর এড়ায়নি।

'আমরা দশজন মিলে এই কাজটি করছি এখন। ভোর সাতটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত পাঁচজনের একটা দল এবং তিনটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আরেকটা দল এই 'লাইফ গার্ডিং'-এর কাজ করে থাকে', জানাচ্ছিলেন কামরুল। এতোদিন পর্যন্ত স্বেচ্ছাশ্রমে এই কাজ করে থাকলেও বর্তমানে সিআইটিআরবি নামক একটি দেশী এনজিও এই কাজে অর্থ লগ্নি করছেন।

সমুদ্র এসে পানির আনন্দে বিলীন হওয়ার পূর্বে নিজেদের নিরাপত্তাজনিত ব্যাপারে সকলের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা উচিত। এক্ষেত্রে সবার প্রথমে 'সেফ জোন ফ্ল্যাগ' ব্যাপারটি নিয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। লাল এবং হলুদ রঙের পতাকা দিয়ে মাঝখানে একটি নিরাপদ সামুদ্রিক স্থান তৈরি করা হয়ে থাকে, এই সীমানার মধ্যে পানিতে নামা কিংবা গোসল করা নিরাপদ। এর বাইরে গেলে চোরাবালিতে পড়া কিংবা তীব্র স্রোতে কাবু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া সাগরে ভাটা থাকলে লাল এবং জোয়ার থাকলে সবুজ রঙের পতাকা ব্যবহৃত হয়। কেবল সবুজ রঙ দেখেই পানিতে নামা বাঞ্ছনীয়। কামরুল জানাচ্ছিলেন, 'আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী

Scanned with CAMSCANNER

যেখানে বড় ঢেউ, গর্ত কিংবা মোটরযান চলাচল করে, সেই এলাকাকে কালো এবং সাদা রঙে চিহ্নিত করা হয় এবং খুব ভালো সাঁতারু ছাড়া সেখানে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। কক্সবাজারে এসব নিয়ম না থাকায় যারা সাঁতার কাটছে তাদের মাঝ দিয়েই স্পিড বোটগুলো ছুটে চলে, যেটা কিনা যেকোনো মুহূর্তে বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।'

সম্প্রতি সেন্ট মার্টিনে সাতজন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর আমরা সবাই জানি। এই অনাকাঙ্ক্ষিত সামুদ্রিক মৃত্যু এড়াতে সমুদ্রে আসা মানুষের সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষিত লাইফ গার্ড। কোস্ট গার্ড এবং ফায়ার সার্ভিস মিলিয়ে কামরুল এবং তার ক্লাবে এ পর্যন্ত সাতানব্বই জনের ট্রেইনিং দিয়েছে। গত বছরে সব মিলিয়ে পঞ্চাশের মত মানুষ উদ্ধার করেছে তারা। তিনি জানাচ্ছিলেন প্রতি বছর পনেরোর বেশি মানুষ কক্সবাজারে মারা যায়। সার্ফিং-এর চেয়ে লাইফ সেভিং-এর দিকে ঝোঁকা কামরুল তাই লোকবল দশ থেকে বিশে উন্নীত করবার স্বপ্ন দেখছেন। এছাড়া সেন্ট মার্টিনের চেয়ারম্যান, কোস্ট গার্ড এবং নেভীর সাথেও তারা কথা বলছেন। সেখানকার স্থানীয় কিছু ছেলে-মেয়েকে 'লাইফ গার্ডিং', পানিতে ডোবার পর প্রাথমিক চিকিৎসার মতো বিষয়গুলো নিয়ে ট্রেইনিং-এর ব্যবস্থা করতে চায় কক্সবাজার লাইফ সেভিং এন্ড সার্ফিং ক্লাব। তাহলে সেন্ট মার্টিনেও হয়তো এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর প্রকোপ কমবে। রূপবান এরকম নীরবে প্রাণ রক্ষাকারী সাহসী মানুষদের অভিনন্দন জানায়! সেই সাথে সবাইকে বলতে চায়, সমুদ্রে নিরাপত্তার ব্যাপারটি একদম অবহেলা করবেন না। যথাযথ নিয়ম মেনে উপভোগ করুন আপনার সমুদ্রবিলাস! ■

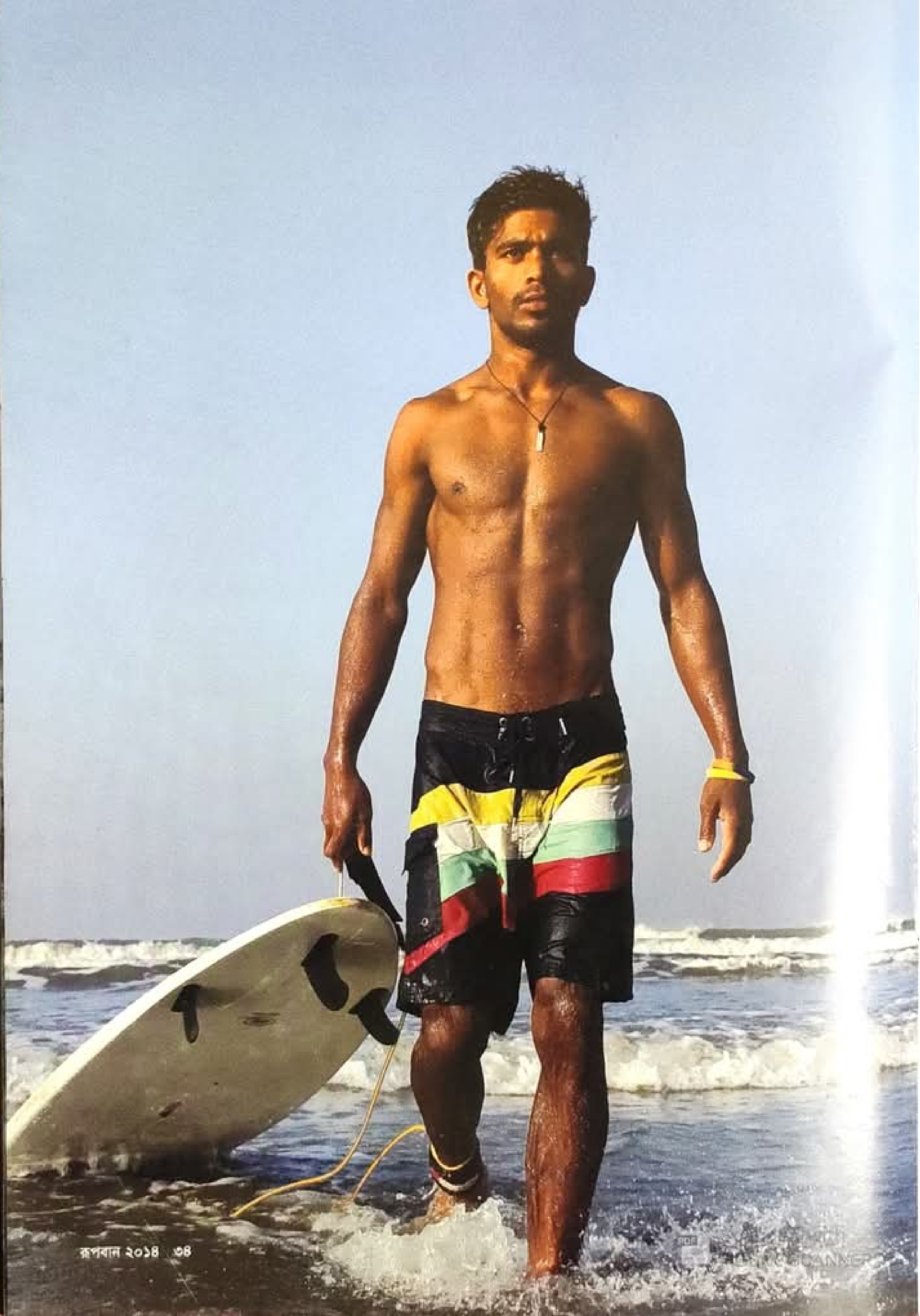

Scanned with
MOBILE SCANNER

প্রকৃতিভাব

সূর্য কি নারী না পুরুষ; চাঁদ আমাদের মামা না প্রেয়সী; পাথর দেবতা নাকি দেবী; আগুন আমার ভাই না বোন; বাতাস, জল, মাটি, আকাশ এদের লিঙ্গ কি? উত্তর পাব এরকম আশা নিয়ে আমরা এমন প্রশ্ন করি না; আমরা এটাও জিজ্ঞেস করি না, বকুল গাছ ছেলে না মেয়ে?

কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর আশা করি, কুকুর ছানাটি, হরিণ শিশুটি, বাঁদরের বাচ্চাটির লিঙ্গ-জ্ঞাপক প্রত্যঙ্গ আমরা প্রত্যক্ষ করি; আমরা বলতে পারি এটি পুরুষ বাঘ আর মা বাঘটি মেয়ে; অতএব মানুষের বেলায় তো কথাই নেই, যেহেতু মানুষ ইকোসিস্টেমের সর্বোচ্চ খাদক এবং সভ্যতার প্রবক্তা। মানুষ শুধু যে নারী-পুরুষ হিসাবে আলাদা আলাদা লিঙ্গের অধিকারী তাই নয়, সেই লিঙ্গ তারা পোশাক দিয়ে ঢেকেও রাখে, যে পোশাক আবার লিঙ্গভেদে পৃথক।

তবু জড় থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী অবধি যাবতীয় সত্ত্বাকে আমরা একটা নামে ডাকি, 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি শব্দটি দিয়ে আমরা আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত সকল কিছুকেই বোঝাই। মোট কথা প্রকৃতির বাইরে আর কিছুই থাকতে পারে না, শব্দটির স্থিতিস্থাপকতা অসীম। প্রকৃতির সমার্থবাহক শব্দ আরও আছে: যেমন- জাহান, মহাবিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ... ইত্যাদি, কিন্তু শব্দগুলোর কোনো লৈঙ্গিক অভিজ্ঞান নেই, অথচ প্রকৃতি শব্দটি স্ত্রীবাচক। বোধহয় এই কারণে বাকি শব্দগুলোর থেকে 'প্রকৃতি' শব্দটির অনুভব আলাদা। এই শব্দটি ভারতীয় দর্শনে, উপমহাদেশের লোকজনের সমন্বিত স্মৃতিতে একটি বিশেষ অর্থের ভূমিকা পালন করে। শব্দটি সজীব আর সজীব বলেই শব্দটির লিঙ্গ পরিচয় আছে: শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গবাচক। কিন্তু প্রশ্ন হলো: সকল বস্তু, শক্তি, প্রাণ, আত্মা, মোট কথা আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত সমস্ত কিছুকে এক নামে ডাকার জন্য পুরুষবাচক শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো না, যখন সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক?

মানুষ, এমনকি পুরুষ মানুষ হয়েও আমরা কিন্তু প্রকৃতিরই অংশ। আর সেই প্রকৃতিকে কল্পনা করা হয়েছে নারী রূপে জগজ্জননী; চিন্ময়ী; শক্তির আধার স্বরূপা এক নারী রূপে। আজও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এই মহা প্রকৃতির উপাসনা করে থাকে।

তো এর যুক্তি কী? জড়-জীবন; বস্তু-শক্তি; নারী-পুরুষ সবকিছুকে কেন একটি অসামান্য নারীবাচক শব্দে প্রকাশ করা হচ্ছে? প্রশ্নটি আমি একজন সাধুজনকে জিজ্ঞেস করে উত্তর পেয়েছি এরকম যে নারী জন্ম দেয়, জননী; সেহেতু সৃষ্টিরত মহাবিশ্ব নারীবাচক এবং প্রকৃতি শব্দটির কল্পনা সেই নারীকেই মনে করিয়ে দেয়। একই প্রশ্ন আমার এক বান্ধবীকেও করে উত্তর পেয়েছি যেহেতু নারী ধারণ করে সেহেতু সমস্ত কিছুকে 'যা' ধারণ করে 'তা' নারী শব্দের রূপকে প্রকাশিত।

এই উত্তর কি সন্তোষজনক? কে জানে? কিন্তু যুগ যুগ ধরে আমাদের উপমহাদেশের আধ্যাত্ম চর্চায় 'প্রকৃতি' শব্দটিকে অত্যন্ত আদর ও শ্রদ্ধার সাথে বরণ করে নেওয়া হয়েছে; প্রখর অধ্যাবসায় ও দারুণ মমতা দিয়ে শব্দটির মর্মের মাঝে অর্থের যে ইঙ্গিত তা সবিস্তারে অনুধাবন ও অনুভব করতে চেয়েছেন নানা বর্গের সাধক জনেরা এবং সেই প্রকৃতির তল খুঁজতে গিয়ে এর অতলে হারিয়ে গিয়ে তারা স্বয়ংই প্রকৃতি হতে চেয়েছেন; সাধক ও সাধিকা উভয়েই।

লোকমনে এই শব্দের প্রভাব ও ব্যাঞ্জনা এতই গভীর; এখানকার পুরাণ ও ধর্মীয় লোককথায় তা এমন স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যাপকতা নিয়ে ছড়িয়ে আছে তাতে এটাই মনে হয় এখানে লোকের ধর্ম বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছে 'প্রকৃতি' বা 'প্রকৃতি ভাব'।

কথিত আছে: একবার সাধিকা মীরা বাঈ বৃন্দাবনে গিয়ে প্রখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামীর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। মীরা বাঈ নারী, এই যুক্তিতে তিনি মীরা বাঈ'র সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান, তখন মীরা বাঈ তাৎপর্যময় একটি কথা বলেন, 'আমি তো এতদিন জানতাম, জগতে পুরুষ একজনই, তিনি শ্রীকৃষ্ণ আর সকল জীব তাঁর দাসী; তবে কোন যুক্তিতে পরম বৈষ্ণব নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করছেন!' এতে শ্রীজীব তাঁর ভুল বুঝতে পারেন।

এটি একটি প্রচল কথা, এখানে ঐতিহাসিক সত্য খোঁজা বৃথা কিন্তু গল্পটি আমাদের জানায় লোকমনের মাঝে প্রোথিত 'প্রকৃতি ভাব' এর

Scanned with MOBILE SCANNER

মূলকথা। মীরা বাঈ নারী, শ্রীজীব গোস্বামীও নারী, যেহেতু দুজনেই প্রকৃতির অংশ। অর্থাৎ জগৎ ভাবনার কোনো এক স্তরে নারী-পুরুষের জৈবিক বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে: পরম সত্যের প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে নারী বা প্রকৃতি। এবিষয়ে আরো কথা বলা যাবে আপাতত আরেকটা উপাখ্যান শোনা যাক!

কল্কি অবতার: ভগবান বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারের মাঝে শেষ অবতার। একটি কল্পে চার যুগ, তার মাঝে শেষ যুগ কলি যুগ। এই কলি যুগে কল্কি রূপে বিষ্ণু অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে। তো প্রতি যুগের মতো কলি যুগেও ভগবান কল্কির জন্য ভগবতী আগেই নির্দিষ্ট। সেই দেবী এবার পদ্মাবতী নামে কোনো এক রাজ্যের রাজকন্যা, তাঁর পতি নির্বাচনের জন্য সয়ম্বর সভার আয়োজন হয়েছে, কিন্তু দেখা গেল যেসব রাজা ও রাজপুত্র পদ্মাবতীকে বিবাহ করার অভিলাষে সভায় উপস্থিত হয়েছেন, কোনো এক অলৌকিক মায়ায় তাদের সকলেই নারীতে রূপান্তরিত হন। তখন পদ্মাবতী বলেন, 'আমি কার গলায় মালা পরাব; সভায় তো কোনো পুরুষ দেখি না।' পরে ভগবান কল্কির সাথেই ভগবতী পদ্মার বিয়ে হয় এবং আগত রাজপুরুষেরা রাজকন্যার সহচরী হয়ে থাকেন; পরে অবশ্য তারা তাদের পুরুষত্ব ফিরে পান।

এই পুরাণ কাহিনিতেও একই ভাব ফুটেছে যে, স্বয়ং ভগবানের কাছে পৌরুষ পরাজিত; তাঁর সাথে পুরুষের অহংকার নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে না। কেবলমাত্র 'প্রকৃতি ভাব' অর্জন করেই তাঁর লীলার সমভাগী হওয়া সম্ভব, তাঁকে আস্বাদন করা সম্ভব।

দুটি গল্পেই দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির সাথে প্রকৃতি অতিরিক্ত একটি ভাব থেকে যাচ্ছে, যাকে আমরা ঈশ্বর বলে থাকি। আবার প্রকৃতি যখন 'রাধা'র প্রতিমায় রূপায়িত তখন সেই ভাব হয় 'কৃষ্ণ'। প্রকৃতি-পুরুষ (ঈশ্বর অর্থে); রাধা-কৃষ্ণ তারা যুগল; একটা থেকে অন্যটাকে পৃথক করা যাবে না। সাগরকে কে দেখেছে সাগরের ঢেউ ছাড়া; আগুনকে কে বুঝেছে তার দহন ক্ষমতা বাদ দিয়ে!

এই তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার জন্যই রাধা-কৃষ্ণের রূপক কাহিনি, নদী-সাগরের উপমা; যেন এক পরম নারী, পরম পুরুষের সমুদ্র বিলাসে নদীর মতো ছুটে চলেছে। হতে পারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিন্যাসে এই উপমাটাই বেশি খাপ খায়, কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। তা হলো নারী দেহেই নিবেদনের উচ্চাঙ্গ উপস্থাপনা। সমাজ-সংসার ছেড়ে, দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে কৃষ্ণের কাছে রাধার চূড়ান্ত আত্মনিবেদন এমন এক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, পুরুষের ভোগী ব্যক্তিত্ব যার কাছে ম্লান। পুরুষ যতক্ষণ পুরুষ, নারীর নিজের সর্বস্ব উজাড় করে নিজেকে দান করার গরিমা ততক্ষণ তার কাছে অচেনা, অধরা। বিশেষ করে যেই অঞ্চলে রাধা-কৃষ্ণের আখ্যান নানা ভাব ও রসে সিঞ্চিত হয়ে মিশে আছে নানা গানে, গল্পে, লোককথায়, নাটকে। তাই এই উপমহাদেশে পরম পুরুষের জন্য ভক্তি, পরম সত্যের কাছে আত্মোৎসর্গের ভাব নারীকে মাধ্যম বানিয়েই বারেবারে জাগতে চায়। সাধক পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পৌরুষকে নস্যাৎ করে ঐ 'প্রকৃতি ভাব' এ ঝাঁপ দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাধনা পূর্ণতা পাচ্ছে না। এই উপমহাদেশে গুরুবাদী সাধনার সকল ধারায় 'প্রকৃতি ভাব' মর্যাদার সাথে গৃহীত ও চর্চিত; আর যেহেতু প্রকৃতি নারী রূপে কল্পিত, সাধক পুরুষকে তাঁর শরীরে নারী ভাব আহ্বান করতে হয় কোনো-না-কোনো মাত্রায়। ভাবের

> অর্থাৎ
> জগৎ ভাবনার কোনো
> এক স্তরে নারী-পুরুষের জৈবিক
> বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে:
> পরম সত্যের প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ
> উভয়েই সমানভাবে নারী বা
> প্রকৃতি।

কোনো লগ্নে এমনও দেখা যায় যে সাধক ধারণ করেন নারী বেশ। শাড়ি-চুরি পরে মহাপ্রকৃতির অনুকরণ করতে চান তিনি। সমাজের অনাধুনিক স্তরে, যেখানে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি শিকড় মেলতে পারেনি সেখানে সাধক পুরুষের এই নারী ভাব ও নারী বেশকে পুরুষের মানসিক বিচ্যুতি, এমনকি যৌনরুচির ভিন্নতা হিসাবেও দেখে না, বরং মূল্যায়িত হয় আধ্যাত্মিক অর্জনের একটি স্তর হিসাবে যার সাথে যৌনতার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই, বরং কাম-কে প্রেমে রূপান্তরের বৃহত্তর অনুসন্ধানের মাঝে এই নারী ভাব অবদান রাখে; সত্যের পরম প্রকাশকে ধারণ করার আধার হিসাবে ব্যয় হয় এই রূপান্তর মানসিকতা, যাকে রূপান্তরকামিতা বা সমকামিতার সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।

এ প্রসঙ্গে সাধক রামকৃষ্ণের উদাহরণ আমরা টানতে পারি, যার মাঝে 'প্রকৃতি ভাব'-এর প্রভাব এতদূর যে এমন গুজবও আমরা পাই যে তাঁর নাকি মাসিকের রক্ত বেরোত। এই তথ্যের সত্য-মিথ্যা আজ আর প্রমাণ করার উপায় নেই কিন্তু বিবেচ্য যে তাকে একজন সাধারণ রূপান্তরকামী হিসাবে কেউ ভাবে না বরং উপমহাদেশের ইতিহাসের এক শুভক্ষণে তাঁকে একজন মনিষীর মর্যাদাই দেওয়া হয়। 'সত্য'কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে পাওয়ার এমন আকুন্ঠ ব্যাকুলতা তাঁর মাঝে যতটা দেখি এমনভাবে আর কোথাও পাই না। তাঁর মাঝে ছিল সহজাত প্রকৃতি ভাব, তাঁকে অন্যান্য সাধকের মতো এটা অর্জন করতে হয়নি; 'পরম'-এর সাথে রমণ-লীলায় তিনি এতটাই সমভাগী ছিলেন যে স্ত্রী সারদা দেবীর সাথে স্বামীর মতো ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিজের মাঝে তিনি যে প্রকৃতি সত্ত্বার অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন সেই সত্ত্বা নারী প্রকৃতির এতোই উচ্চতর পর্যায়, যে পর্যায়ে অবস্থান করে নারীর প্রতি পুরুষের মতো ব্যবহার করা সম্ভব না। প্রকৃতি জগজ্জননী, তাই স্ত্রী সারদাকেও মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করতেন তিনি! প্রকৃতির প্রতি অত্যাধিক শ্রদ্ধার ফলেই তিনি ছিলেন প্রকৃতি ভাবে মাতোয়ারা; সেই ভাব থেকে নেমে এসে সাধারণ পুরুষ ভাবে প্রকৃতিকে ভোগ করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল।

তাঁকে যদি একজন সাধারণ রূপান্তরকামী হিসাবেও দেখা হয় তখনও তাকে এভাবেই ভাবতে হবে যে, তিনি একজন পথিকৃৎ, কেননা সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত রূপান্তরকামী বাসনাকে এমন এক পথে প্রবাহিত করেছেন যেখানে এই সত্ত্বার আশু সমাধান রেখে গেছেন। এমন এক উচ্চতায় তিনি এই সত্ত্বাকে স্থাপন করেছেন যে, এই সত্ত্বার সামাজিক গ্রহনযোগ্যতাই শুধু নয় এই সত্ত্বাকে একটি কাঙ্ক্ষিত সত্ত্বার মর্যাদায় উত্তরণ ঘটিয়েছেন। অবশ্য সেজন্য সমাজের ভিতরেও এমন কিছু উপাদান থাকতে হবে যা নিষিক্ত হওয়ার জন্য এ জাতীয় বিশিষ্ট সত্ত্বার অপেক্ষায় থাকবে। আমাদের উপমহাদেশে এই উপাদান আছে, প্রকৃতি ভাব-এর সামাজিক স্বীকৃতি রূপে।

আবার 'প্রকৃতি ভাব'-এর মাঝেও আছে এমন কিছু উপাদান যা নারী-পুরুষ-রূপান্তরকামী-সমকামী-উভকামী, এইসব শ্রেণীতে মানুষকে বিন্যাস করার যে রীতি তার বিকল্প একটা রীতির দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে মানুষের জৈবিকতার স্বীকৃতি থাকবে কিন্তু সেটা মানুষের পরিচয় হবে না। মানুষের পরিচয় হবে সে প্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতি যে সত্ত্বায় নিজে বিবর্তিত হতে চায়, সেই অধরার প্রেমিকা রূপে এক বিনম্র উম্মাহ হিসাবে। ■

বান্দরবানের গহীনে

'দেশের এই বাজে পরিস্থিতিতেও কি তোর ঘুরতে যাওয়াই লাগবে?'

কয়েক মাস পেছনের কথা বলছি, দেশের অবস্থাটা তখন আসলেই বেশি সুবিধার না, বাস-ট্রাক পুড়ছে, ট্রেনগুলো স্লিপারের খেই না পেয়ে ধান ক্ষেতে মুখ থুবড়ে পড়ছে, হরতালের পর হরতালের ঘোষণা আসছে। এমন পরিস্থিতিতে ভ্রমণের দুঃসাহস করাটা হয়তো কেবল বিলাসিতা নয়, বিড়ম্বনাও বটে। তবুও আমি নাছোড় বান্দা, যাওয়ার জন্য গোঁ ধরে রইলাম। এতে যদি সদ্য আঠারোতে পা দেয়া আমার ঘরকুনো বাঙালী হবার গ্লানি কিছুটা হলেও কমে! হরতালের প্রতিবন্ধকতা সেই আত্মতেজস্বারের আগুনে যেন ঘিয়ের কাজ করছিল, আমাকে থামায় সাধ্য কার! আমাদের গন্তব্য ছিলো বান্দরবান, ঠিক মূল শহরটা নয়, তার আরো ভিতরে, আরো দুর্গমে! বান্দরবান নামটার মধ্যেই একটা কেমন যেন বুনো পাহাড়ি গন্ধ, আমার রক্তে রক্তে সেই বুনো গন্ধ তখন উত্তেজনার ঢেউ তুলেছে। কলাবাগান থেকে রাত এগারোটায় বাস ছাড়বার কথা থাকলেও আমি সেই সাড়ে দশটায় এসে উপস্থিত। কাঁধের ব্যাগে খুব সীমিত জিনিসপত্র, শুনেছি ট্রেকিং করতে হবে অনেক, তার বাড়িয়ে পথ্য-বিলাসীতার সুযোগ কোথায়!

আমরা এগারোজন যাচ্ছি, এগারোটা ছেলে। বাইরে থেকে দেখলে বান্দরবানে যাওয়া আর দশটা গ্রুপের মতো আমরাও একটা গ্রুপ। তবে এখানে কিছুটা বৈচিত্র্য আছে, সাধারণত একসাথে দল বেঁধে ঘুরতে যায় যারা তারা হয়তো একই কলেজের বা ইউনিভার্সিটির

Scanned with PDF SCANNER

পড়ে, একই অফিসে চাকরি করে অথবা একই বয়সের এক পাড়ায় থাকা এক ঝাঁক তরুণ। আমাদের সবার বয়স এক নয়, আমরা এক পাড়াতেও থাকি না, এক ইউনিভার্সিটিতেও পড়ি না, তবুও আমরা এই যে একসাথে এতশত কিলোমিটার পথ পেরবো এখন, সেটা কিসের ভিত্তিতে? হ্যাঁ, একটা সাধারণ পরিচয়ের ধোঁয়া এখানে তোলা যায় হয়তো, আমরা সবাই সমপ্রেমী। তবে আমি একদমই বলতে নারাজ যে কেবল আমাদের যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে আমরা আজ এই এতগুলো মানুষ দেশের এমন পরিস্থিতিতেও একসাথে ঘুরতে বেরিয়েছি। এই পরিচয়টা দিয়ে সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও দিন গড়িয়ে সেখানে প্রেম, বন্ধুত্ব, আবেগ, চাহিদা কিংবা সব ছাড়িয়ে একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের সম্পর্কই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে বাসে উঠতে থাকা দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত, ভিন্ন বয়স আর বিভিন্ন পেশা থেকে আসা এই এগারোটা ছেলে যেন তাদের সবরকম পরিচয় ছাপিয়ে তাই সবার আগে মানুষ হিসেবে আমার চোখে ধরা পড়লো।

গ্রুপে নাকি অনেক কিছু হয়! আমার আগে এর ওর কাছে অনেক রকমের ফিসফাস শুনেছি, পাত্তা দেইনি। বাসে উঠে সবার গল্পবাজিতে পরিবেশটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আপন হয়ে গেল। কয়েকজনকে আগে থেকেই চিনতাম, কয়েকজনকে নতুন চিনলাম। দুইজোড়া যুগল এসেছে, রায়হান-অমি ভাই আর ওদিকে সাগর-ইমরান ভাই। সাগর ভাইয়ের সাথে ইমরান ভাইয়ের খুনসুটি দেখতে ভালোই লাগছিলো, খোঁচা না দিয়ে কেউ কোনো কথাই বলে না। আমি হেডফোন কানে লাগিয়ে বাইরের অন্ধকারে কি সব খুঁজতে খুঁজতে কখন যে চোখ বুজেছি, সেটা আর খেয়াল নেই।।

ঘুম ভেঙে দেখি চারদিক পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে। কানের পাশ দিয়ে ছোট-বড় টিলা সাঁই সাঁই করে পালিয়ে যাচ্ছে। বান্দরবানে ঢুকে গেছি তারমানে! আমি আমার সিট থেকে উঠে সামনে গেলাম, দেখি সাগরের কোলের মধ্যে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে কাঁদা হয়ে আছে ইমরান ভাই। অন্যরা একটু আধটু গল্প করছে। আমাদের এই ট্যুরের পরিকল্পনাকারী হিমেল ভাই দেখি ঘুম থেকে উঠে ড্রাইভারকে অচেনা রাস্তা বাতলাচ্ছেন।

অবশেষে বাস স্ট্যান্ডে নামলাম সবাই।

আমার মনে হচ্ছিল আমি সবুজের নদী কেটে কেটে অজানা কোথাও হারিয়ে যাচ্ছি, উঁচু-নিচু রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিলো বড় বড় ঢেউ। চারপাশে অসহ্য বুনো সবুজ, সরু রাস্তার দুই ধারে শত শত ফুট নিচু খাদ, ইচ্ছে করে লাফ দিয়ে ওখানে হারিয়ে যাই!

কয়েকজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। ওদিকে আমি, ইমরান ভাই, আলভী ভাই, যুবরাজ আর হিমেল ভাই একটা রেস্টুরেন্টে যেয়ে বসলাম। একে একে ফ্রেশ হলাম, নাস্তা এলো সামনে। ক্ষুধার্ত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে মুহূর্তেই টেবিলে রাখা খাবারের স্তূপ আমাদের পেটের অন্তঃপুরে জায়গা করে নিলো। দুই যুগলের খুনসুটি দেখতে দেখতেই হিমেল ভাইয়ের ঘোষণা এলো যে চান্দের গাড়ি চলে এসেছে। আমিই মনে হয় সবার প্রথম দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। মিনহাজ ভাই এসে বলল যে প্রাকৃতিক রোলার কোস্টার রাইড চাইলে খোলা ছাদে বসবার বিকল্প নেই। গাছের ডালে বাড়ি লাগলে কি কি হতে পারে সেসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ছাদে উঠে পড়লাম। ছাদে আমাদের সাথে কিছু পাহাড়ি লোকেরাও গাদাগাদি করে বসলো, মাথায় রাখা শুঁটকির ডালি থেকে আসা উৎকট গন্ধটা ভুলে যেতে সময় লাগলো না আমার। গাড়ি চলছে। চান্দের গাড়ির খোলা ছাদে বসা এই ভ্রমণ আমার জীবনে এতো নতুন একটা কিছু যোগ করবে আগে ভাবিনি। আমার মনে হচ্ছিল আমি সবুজের নদী কেটে কেটে অজানা কোথাও হারিয়ে যাচ্ছি, উঁচু-নিচু রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিলো বড় বড় ঢেউ। উঁচু চূড়া থেকে গাড়িটা যখন নিচে নামে, তখন আসলেই রোলার কোস্টারের মত মনে হয়। বিস্ময়ে চান্দের গাড়ির গ্রিলের খাঁচিতে শক্ত করে ধরে থাকা হাত কখন যেন নরম হয়ে এলো, চারপাশে অসহ্য বুনো সবুজ, সরু রাস্তার দুই ধারে শত শত ফুট নিচু খাদ, ইচ্ছে করে লাফ দিয়ে ওখানে হারিয়ে যাই! কিছুক্ষণ বাদে নতুন এক বিস্ময় আমাকে অভিভূত করলো, এক দঙ্গল মেঘের কুয়াশা গাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লো! ভেজা-ভেজা পেজা মেঘগুলো গা কেটে কেটে চলে যাচ্ছে, আমি অভিভূত! গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে এই বুনো বান্দরবান আমার চোখে কোনোদিন হয়তো ধরা পড়তো না। তবে আপনারা যারা ছাদে বসবেন, মাথা ঢাকার জন্য অবশ্যই কিছু সাথে রাখবেন। পাহাড়ি 'সানবার্ণ' বেশ ভয়ঙ্কর জিনিস! রাস্তার চারপাশে মিনি বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপন। 'মারমা' আদিবাসীদের রাজা-রাণীর ছবি দিয়ে তাদের পরিচিতি দেওয়া আছে। পড়তে পারা গেলো না, গাড়ি ছুটছে পাগলা ঘোড়ার গতিতে। নীলগিরিতে আমরা কয়েকজন নামলাম। আমি খুব উত্তেজিত থাকলেও মূল জায়গাটা দেখে চুপসে গেলাম। একটা রিসোর্ট আর সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছাড়া আর কিছু না। আমার কেন যেন চট করে গ্র্যান্ড কেনিয়নের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ওটা হল গাছ-মানববিহীন, শত

মরুভূমি আর নীলগিরি সবুজে সজিবময়! দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া হৃদয় নিয়ে চান্দের গাড়ির ছাদে আবার আসন গ্রহণ করলাম। প্রায় ঘন্টা চারেক বাদে আমরা গাড়ি নিয়ে একটা স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করলাম। আশেপাশে সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পেলাম আমরা এসেছি 'থানচি'-তে।

পাহাড়ি বাজার বলে আলাদা কিছু চোখে পড়ছে না এখনো, চারপাশে অনেক বাঙ্গালী দেখে মনে হচ্ছিল বাজারগুলোকে হয়তো ওরা ওদের অভ্যন্তরীর বাইরে চেহারা দিতে চায়নি।

খাওয়াদাওয়া শেষে এবার যাত্রা 'তিন্দু'র পথে। বেশ কিছুটা ক্লান্ত তখন সবাই, আমি মনে মনে ভাবলাম এই ভ্রমণ কি চলতেই থাকবে? এবার যাত্রা নদী পথে, 'নৌকায়'। শুনলাম এই যাত্রাপথে একজন গাইডও আমাদের সঙ্গ দেবে। তার নাম 'কেনু মং', মারমা আদিবাসী। কথার মধ্যে জড়তা আছে কিন্তু বাংলা ভালোই বলতে পারে। থানায় 'পারমিশন' আনতে আরাফাত ভাই এবং গাইড গেলো সঙ্গে। সেখানে এক গাদা প্রশ্নের জবাব দিয়ে বিধ্বস্ত মুখে নৌকায় উঠলাম।

প্রমত্তা সাঙ্গু নদীর কথা এতোদিন বইয়ে পড়েছি, ঐদিন প্রথম সাক্ষাৎ। তবে শীতকাল হওয়ায় নদী একেবারেই শান্ত, হাঁটুসমান জল থাকবে হয়তো। মিয়ানমারের একদম বর্ডার ঘেঁসে এর উৎপত্তি, মদক নামের একটা জায়গায়। বাংলাদেশের ভিতরে খুব অল্প যে কয়েকটা নদী জন্মেছে, সাঙ্গু তার মধ্যে অন্যতম। পুরো নদীর তলা জুড়ে কেবল পাথরের ছড়াছড়ি, মাঝে মাঝে পাথরের খাঁজে নৌকা আটকেও যায়। নৌকায় গাইডের সাথে আরেকজন যে হেল্পার আছেন, তিনি একটা বড় বাঁশ দিয়ে পাথরে ঠেকিয়ে সামনে পথচলা নিশ্চিত করেন।

নৌকা যতোই সামনে এগুচ্ছে ততোই যেন এক অচেনা জগতে প্রবেশ করছি। এখানকার আশেপাশের প্রকৃতি চেনা নয়, সবুজগুলো কেমন যেন অন্যরকম। হঠাৎ পাশের নৌকাসমেত সবগুলো মানুষ যেন চোখের সামনে গাপ হয়ে গেল। ছলাত ছলাত একটা শব্দে শীতের সেই বিকেলটায় আমি আর চারপাশের নিঃঝুম বুনো নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই যেন বাস্তব নয়। মনে হচ্ছে সভ্যতা আর জনপদ ছেড়ে রহস্যময় এই নদীর বুকে ভাসতে ভাসতেই বাকি জীবনটা পার হয়ে যাবে। দুপাশে পাহাড়ের দঙ্গল, তার বুকে সবুজ বৃক্ষরাজি। বেশিরভাগ গাছই পরিচিত নয়। পাহাড়ি জঙ্গলের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে হাজারো পাখির কিচিরমিচির। ততোক্ষণে সন্ধ্যা নামছে, কিচিরমিচির শব্দও যেন সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

আমরা অবশ্য তিন্দু পৌঁছে গিয়েছি ততোক্ষণে। পাহাড়ের উপর কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। সেখানে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি আছে অনেকগুলো। গাইড সেখানকার স্থানীয় মানুষের সাথে আলাপ করলো। তাদের ভাষা বুঝলাম না। সম্ভবত মারমা ভাষায় কথা বলছে। গাইড মুখ শুকনো করে বলল, 'জায়গা খালি নেই। এখানে থাকা যাবে না।' আমরা হতভম্ব। এই প্রায় জনমানবশূন্য জায়গায় মাথা গুঁজবার ঠাঁই কই পাবো? এরপর আবার নৌকায় এগুচ্ছি আমরা, নতুন বাড়ির খোঁজে। সেই অন্ধকার শীতের সন্ধ্যা, অনিশ্চিত রাত্রিযাপন আর গন্তব্যহীন যাত্রা যেন আমাকে আরো উন্মাদ করে দিলো। যা হয় হবে, প্রকৃতির মাঝে আজ বিলীন হবো! হঠাৎ আবছা অন্ধকারের মধ্যে থেকে বিকট আকৃতির কি যেন একটা বেরিয়ে আসতে দেখলাম, নৌকা এগুতে থাকলে বুঝলাম ওটা আসলে সেই বিরাট দানবাকৃতির বিখ্যাত পাথর! এগুলোর কথা শুনেছি অনেক। গাইডের কাছে জানতে পারলাম স্থানীয়রা একে বলে 'রাজা পাথর'। কিছুক্ষণ পর চরের মতো একটা জায়গায় থামলাম। সেখানে মাত্র দুটো ঘর। সেখানেও খোঁজ নেওয়া হল। নাহ! নেই থাকার মতো জায়গা! সবার মাথায় তখন হাত! সারাদিন দৌড়ের উপর আছি আর এখন একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিলবে না। হিমেল ভাই সাথে করে তাঁবু নিয়ে এসেছেন, যেখানে চারজন থাকতে পারবে। সবার মুখ শুকনো। আমি আকাশ দেখছি। সারা আকাশজুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট গুঁড়িগুঁড়ি তারা, রাত গভীর হলে আরও স্পষ্ট দেখা যাবে। ওদিকে গাইডদের সাথে আলভী ভাই পরামর্শ করছেন। কি করা যায়, কোথায় থাকা যায়। আমি চায়ের দোকানের মতো ঘরটার কাছে এগিয়ে গেলাম। আসলে ঘরটা এক প্রকার দোকান বলা যায়। বিস্কুট, চা, অন্যান্য টুকটাক জিনিসপত্র পাওয়া যায়। টেনশন লাঘবের জন্য কিনা জানি না, সবাই চায়ের অর্ডার দিলো। কথা বলতে বলতে, হাসি ঠাট্টা করতে করতে টেনশন প্রায় উড়েই গেলো সবার। এক অন্যরকম আনন্দ দেখতে পেলাম সবার মধ্যে। এরই মধ্যে গাইড এসে সুখবর দিল, সামনে একটু এগুলেই কিছু ঘর পাবো। সেখানে থাকা সম্ভব। আমরা সবাই যে যেখানে ছিলাম একত্রিত হয়ে গাইডের সাথে রওনা হলাম। ছোটবড় পাথুরে রাস্তা, আস্তে আস্তে সাবধানে পা ফেলতে হয়। প্লাস্টিকের ইজি স্যান্ডেল পরেও হাঁটতে হিমশিম খাচ্ছি। উঁচুনিচু পাথর পাড়ি দিয়ে সামনে ঘর

দেখতে পেলাম মাত্র দুটো। কিন্তু তাও নদীর ওপারে। দূরত্ব বেশি না তাই অন্ধকার নদীর হিমশীতল স্রোতে নেমে গেলাম সবাই, অবশেষে ঘর তো পেলাম! গাইড আমাদেরকে বলল, 'এই ঘর না। এইখানে আপনারা খাবেন। আর থাকার ঘর ঐযে উঁচু জায়গার মতো দেখছেন না? সেইখানে!'

যাই হোক আমরা ঘরটাতে এলাম শেষ পর্যন্ত। ঘরটা আহামরি কিছুই না, বেড়ার ছোট্ট একটা ঘর। চাপাচাপি করে এগারো জন কোনোমতে থাকতে পারবে। আমরা সবাই কাপড় ছেড়ে সামনের নদীর তীরে চলে গেলাম, প্রচন্ড ঠান্ডা জলে সব ক্লান্তি ধুয়ে বিসর্জন

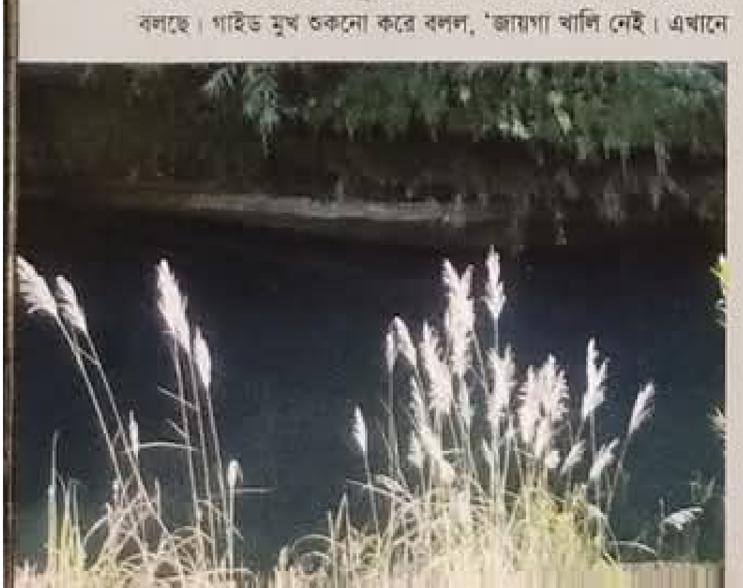

Scanned with MOBILE SCANNER

দিতে। জায়গাটা বেশ সুন্দর। বিশাল খোলা জায়গা, মাটি পাথরে ঢাকা, পাশে পাহাড় আর তার কোল জুড়ে নিখুঁত স্পষ্ট তারা। সুন্দর রাত!

খাবারের ডাক পড়লো, সবাই ছুটতে ছুটতে গেলাম। ভাত, মুরগীর লালচে রঙের ভুনা, শুঁটকির চচ্চড়ি, কয়েক পদের ভর্তা, ডাল সবই আছে। পাগলের মতো হামলে পড়ার কিছুক্ষণ বাদেই প্রচণ্ড ঝালে সবাই বিধ্বস্ত! ইমরান ভাই দেখলাম সাগরকে মাংস ধুয়ে ধুয়ে দিচ্ছে, এতো ঝালের মাঝেও ঐ দৃশ্য দেখে হাসি পেল।

খাবারের শেষে সবাই বাইরে বসলাম। আড্ডাবাজী চলল, গান হল। তারপর একে একে চলে গেলো ঘরে। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠে নাফাকুম যেতে হবে তাই আগে আগে ঘুমিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। কিসের ঘুম! সবাই হাসাহাসি করলো শুয়ে শুয়ে, রায়হান আর অমি ভাই তাদের প্রেমকাহিনী শুনিয়ে ব্লকবাস্টার তালি পেল! এসব করতে করতেই কখন সব ঘুমিয়ে কাদা টেরটিও পাইনি!

পরদিন সকালে সেই কাঙ্ক্ষিত দেশী নায়াগ্রা তথা নাফাকুম-এর পথে যাত্রা। প্রাতঃফটোসেশন শেষ করে

খাবারের অধিবেশনে যোগ দিলাম, সম্ভবত রাতের খাবারের দুর্নাম শুনেই রাঁধুনী সচেতন হয়েছেন, খাবারের মান তাই বাসার চেয়েও উত্তম! সকাল দশটায় শুরু হলো আমাদের 'রেমাক্রি'র পথে যাত্রা! ছয়জন-পাঁচজনের দুই গ্রুপ দুই নৌকায় নদীতে ওঠামাত্র ব্যস্ত হয়ে পড়লো নৌকা বাইচে। চিৎকার করে, একে অন্যের গায়ে পানি ছিটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের নৌবিহার। বয়সে সবার ছোট হওয়ায় আর সাঁতার না জানায় সবাই যে আমাকে চোখে চোখে রাখছিলো সেটাও বেশ টের পাচ্ছিলাম ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে। আজকের নৌপথ কালকের চেয়েও কিছুটা দুর্গম। যেতে যেতে এর সত্যতা পেলাম, অনেক জায়গায় নৌকা থেকে নেমে শৈবালে ঘেরা পাথুরে পথ বেয়ে হাঁটতে বাধ্য হলাম। পথে একটা ছোটো জলপ্রপাত, আর রক্ষা নেই! আলভী, ইমরান আর আরাফাত ভাই সেখানে পৌঁছামাত্র ব্যাগ ফেলে ঐদিকে দৌড় লাগালেন। রাজকীয় না হলেও এই হাম্মামখানায় বিলাসিতা করার মতো পরিবেশ বানিয়ে নেওয়া যায় 'মনে মনে!'

নাফাকুম এখান থেকে আড়াই ঘন্টার পথ, এবার হাঁটতে শুরু করলাম। হিমেল ভাই পাশে এসে গল্প জুড়ে দিলে টেরটিও পেলাম না দলের বাকিরা কখন অদৃশ্য হয়ে গেল। ভুল রাস্তায় এসেছি, তাই আবার পাহাড় বেয়ে নামতে হলো খানিকটা। চলার পথে পাথরের মাথায় গাঁদাফুল জড় করে প্রণামরতা এক কিশোরীকে দেখে স্নিগ্ধতায় মনটা ভরে গেল।

অবশেষে নাফাকুমে পৌঁছালাম, ছোট জলপ্রপাত হলেও সৌন্দর্যে প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। সবাই উত্তেজিত, একে-ওকে বরফশীতল জল ছিটিয়ে যেন নাফাকুম জয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম আমরা সবাইকে। ফিরতি পথে নৌকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা। রেমাক্রি বাজারেই রাতটা কাটাতে হলো।

শেষের দিনটা রেমাক্রি বাজারেই ঘুরে ফিরে কাটালাম, বাজার থেকে নানারকম ফল সবজি কিনে ঠিক হলো রাতের রান্নাটা আমরা নিজেরাই করবো। বেশ একটা পিকনিক ভাব হবে! রাতে যুবরাজ আর আরাফাত ভাইয়ের রান্না খেয়ে আমরা সকলেই প্রশংসার ঝাঁপি খুলে বসলাম। এরপরের গল্পটা অনেকটা 'রিক্যাপে'র মতো, ফিরতি পথ, তবে বান্দরবানে এসে জানলাম ঢাকায় যাবার সব বাস বন্ধ, ঢাকায় তখন তাণ্ডব চলছে। চট্টগ্রামে পর্যন্ত এলাম, সেখান থেকে কোনোমতে একটা মাইক্রো ভাড়া করে ঢাকায় পৌঁছালাম, বিদায় জানালাম লাস্যময়ী সবুজকে। অসহ্য সৌন্দর্যের সাথে প্রাণখোলা বন্ধুত্বের মিশেলে যে অনন্য কয়েকটা দিন প্রকৃতি-পাড়ে কাটিয়ে এলাম, ঢাকায় সব গোলমালের মধ্যেও তার রেশ কাটেনি বহুদিন!

আপনারা যারা দেশের ভিতরে ঘুরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য বান্দরবান হতে পারে বেড়ানোর জন্য 'স্বর্গ'। বান্দরবান শহর থেক থানচি যেতে হয় চান্দের গাড়িতে করে। অবশ্য বাসেরও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাস নির্দিষ্ট সময়ে ছেড়ে যায়। আগে থেকে খোঁজ নিয়ে রাখা ভালো। আর এমন জায়গায় দল করে গেলে খুবই ভালো, এতে ভ্রমণে আনন্দও বাড়ে। নিরাপদও থাকা যায়। চান্দের গাড়িতে ৪ ঘণ্টা লাগবে থানচি যেতে। আগের থেকে গাইড ঠিক করে রাখবেন। ঢাকা থেকে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এরপর থানায় অনুমতি নেওয়া সেরে নৌকায় করে তিন্দু হয়ে রেমাক্রি যেতে হবে। সেখান থেকে নাফাকুম পায়ে হেঁটে যেতে হবে, ৩ ঘণ্টা লাগতে পারে যেতে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, রেমাক্রি বাজারে থাকাটাই নিরাপদ হবে। সেখানে খাওয়াদাওয়া করতে পারবেন, ঘরও পাবেন ভালো। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

আ তে আদর

আঁতুড়ঘরে মা নামক নারী আদর ডালির পসরা সাজায় দশটি মাস। নবজাতক ধরার বুকে আগমন করে সেই পসরা নিয়ে বনে যায় ফেরিওয়ালা, শেষকাল অবধি চলতে থাকে আদরের বিকিকিনি।

আদর বাজারে নিত্য আনাগোনা আবালবৃদ্ধবনিতার। বয়সভেদে, ব্যক্তিভেদে, দেহমনভেদে চলে আদান-প্রদান। বিস্তর আয়োজনে সদা কর্মরত ফেরিওয়ালা সকল। উপযুক্ত দরে কিনে নিলেই হলো!

আশকারা পাওয়া শিশুটির আদর সঞ্চিত মায়ের আঁচল তলে। কিশোর-কিশোরীর মন আদর খোঁজে লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখা প্রেমিক প্রেমিকার মিষ্টি আলাপে। যুবক-যুবতীর দেহমন উশৃঙ্খল আদরের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে আকুল। পূর্ণবয়স্ক নরনারীর আদর ডালি উড়ে আসে প্যানডোরার সেই সর্বনাশী বাক্স হতে। আমরণ এই বিকিকিনিতে ক্লান্ত হয় না কি দেহমন? একটু কি একঘেয়েমি আসে না? রঙবেরঙের চকলেট, ক্যান্ডি, আইসক্রিমে ছোট শিশুর অরুচি এসেছে কি কোনো কালে? একটা হাতে রেখেই আরেকটা পেতে উতলা! দেহমন তো আরো লোভী। সে চায় আদরের সবটুকুরও একটু বেশি।

আয়েশি দেহ তাই আলসেমিতে এলিয়ে পড়ে আলতো আদরে। আবেগি মনের আবার তাতে অরুচি। আলিঙ্গনে চূর্ণ হয়ে পূর্ণ হয় সে। সকালের আদর বিকেলে ফিকে হয়ে যায়। রাত্তিরের আঁশ মেটে না সাঁঝের আদর আস্বাদনে। সুস্থ্য-সবল দেহ আদরের কাঙ্গাল। রোগ-শোক-জরায়ও কি আদর বিনা মুক্তি মেলে?

একজন পুরুষ হয়ে আরেকজন পুরুষের কিংবা নারী হয়ে অন্য নারীর কাছে আদরের যে আহ্বান, তাতে কি কালব্যাপ্ত আদরের যে চিরন্তর অভিব্যক্তি, সেখানে একটুও তফাত থাকে? আদরের কি কোনো লিঙ্গ থাকে, কোনো দেশ-কাল-সময় কিংবা ভাষা থাকে? নিবু নিবু আলোতে আঁধারে অধরের সাথে অধর গলে যায় যখন, সেই দৃশ্যে দুজন পুরুষ কিংবা দুজন নারীর দৃশ্যমান হওয়াটা কি এতটাই দূষণীয়? তবে কি আমার আদরেও ভাগ বসাবে সমাজ? তবে কি আমার স্পর্শেও থাকতে হবে শুদ্ধতার বাড়াবাড়ি? এইমাত্র ওর পায়ের ফাঁকে পা সেঁধিয়ে দিলাম, দুজোড়া পুরুষালী পা সাপের মতো এঁকেবেঁকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে একাকার, দুজোড়া সামর্থ্যবান শক্ত পুরুষালী পা! একটু থামুন, আপনার ভাবতে ঘেন্না লাগছে? কেন? আপনি এরকম দেখে অভ্যস্ত না বলে? আপনার অরুচির দায় দয়া করে আমার ঘাড়ে চাপাবেন না। অন্যদিকে তাকান! আমি এখন ওর গালের সাথে গাল ঘষবো। গত পরশুদিন শেভিং ক্রিম ফুরিয়ে যাওয়ায় দুদিন ধরে দাড়ি কামাই না, শক্ত ক্ষুরধার দাড়ির আঁচড়ে আমি এখন অগ্ন্যুৎপাত করবো। ওর গালেও দাড়ির একটা হালকা প্রলেপ যেন বিনা প্রতিবাদে আমার কাছে হার মেনে নিলো, আঁচড়ে আঁচড়ে গাল লাল হয়ে গেল ছেলেটার। খুব খারাপ লাগছে আপনার? বমি চলে আসছে? গত কয়েক বছরে কতশতবার ওর কপালে আর গালে আমার ঠোঁট পড়েছে জানেন? ওর কপালটা সেরকম চওড়া না, আমার বড়সড় ঠোঁটটা আরাম করেই পুরোটা কপাল ভোগ করতে পারে। প্রায়ই ছেলেটার চুলে টেনে ধরে ওর কপালটা আমার ঠোঁটের আয়ত্তে নিয়ে আসি। তাতে লাভ কি হয় জানেন? এ-ই ওর সঞ্জীবনী, যখন চারপাশের সবকিছুর ভারে ওর ছোট্ট শরীরটা নুইয়ে পড়তে থাকে, এই মুহূর্তের চুম্বন ওকে আবার জাগিয়ে তোলে। আর প্রতিদান? আমার ডানপাশের খসখসে গালটায় শক্ত করে কামড়ে ধরে প্রতিদান দেয় ও। আপনার কিংবা আপনাদের কাছে এই দান-প্রতিদানের উলটো পাশের অপরধটা চোখে পড়তে পারে, কিন্তু আরেকবার ভাবুন তো, একটা মানুষ ভালোবেসে আরেকটা মানুষের সাথে গালে গাল লাগিয়ে কিছুটা উষ্ণতা যদি ভাগাভাগি করে নেয়, মনুষ্যত্বের কি এমন বিপর্যয়টা সেখানে নেমে আসবে? দুজন পুরুষ কামান দাগিয়ে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে একে অন্যের সাথে লড়াইয়ের চাইতে এই ভালোবাসাই কি মনুষ্যত্বকে দুদণ্ড শান্তির মুহূর্ত দেয় না? তবুও আমি অপরাধী? তবে নাহয় হলামই আজ আদরের দায়ে দণ্ডিত, তবুও কেবল একজন মানুষ হয়ে মানুষের জায়গা থেকে বলি, কাউকে ঘৃণার চাইতে আদর অধিক স্বস্তিদায়ক! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

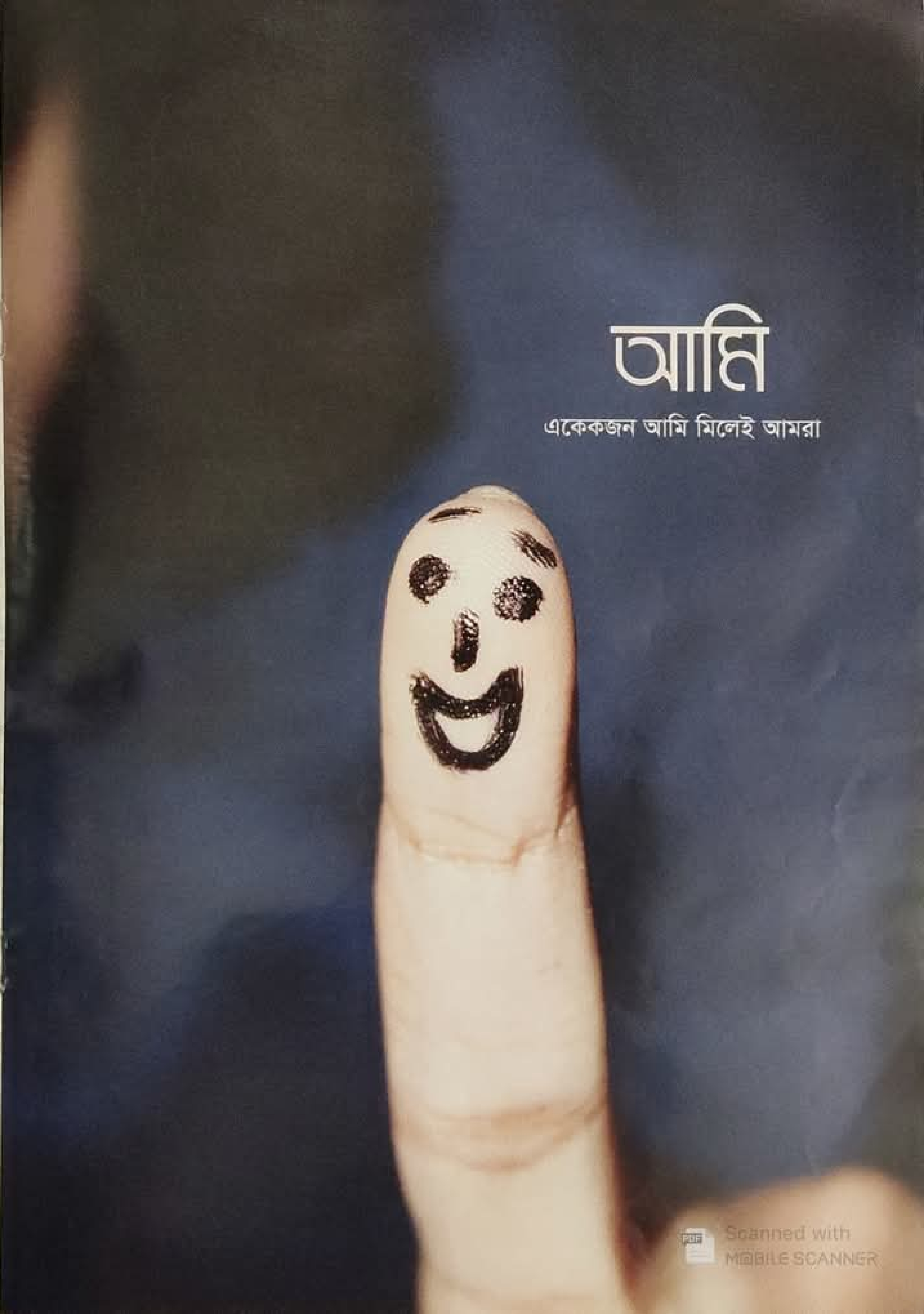

Scanned with MOBILE SCANNER

আমি বিয়ে করতে চাই না!

একে একে [illegible] ঢুকিয়ে এবার চলছে [illegible] চারদিকে [illegible] শিফন আর জর্জেটের ছড়াছড়ি, [illegible] রোশনাই, বাদ্য-বাজনা, চিৎকার আর হইহুল্লোড়ে [illegible] এক [illegible] পোলাও, বিরিয়ানি আর [illegible] ঢুকে গেছে। [illegible] হাত ধোয়ার পরেও হাত থেকে [illegible] না। এদিকে একের পর এক অচেনা [illegible] অভিনন্দন জানাচ্ছে,

মিথ্যা একটা হাসি আমার মুখ থেকে খসে হাঁসফাঁস করে কোথাও পালাতে চাচ্ছে। কি করছি আমি? ওয়েস্টের শেরওয়ানী, নাগড়া গায়ে পায়ে চাপিয়ে এই গন্ডা গন্ডা অচেনা মানুষের ভিড়ে কি করছিটা কি আমি? ভিড়, শোরগোল, অচেনা মানুষ তো আমি জন্মের পর থেকেই অপছন্দ করি। এই পুরো বিয়ে বাড়ির সব মিলিয়ে দশটা মানুষও হয়তো ঠিকমতো জানে না আমার পুরো নামটা কি, অথচ সবার বরের সাথে একটা ছবি থাকা চাই! একটু পরপর ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় আমি অন্ধ হবার জোগাড়, ইচ্ছা করছে গা-পা থেকে সবকিছু খুলে ফেলে ন্যাংটো হয়ে কোথাও পালিয়ে যাই। জর্জেট, সিল্ক, ভারী গয়না, শরীরে মাখা দামি পারফিউমের সাথে ঘাম, খাবার সব মিলে মিশে এক উৎকট তীব্র কটু গন্ধময় পরিবেশ। আমি শামীম আহমেদ, বয়স উনত্রিশ, বাংলাদেশী রীতিনুযায়ী বিয়ের ডঙ্কায় বাড়ি পড়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আইবিএ'র ছাত্র ছিলাম,

একটা বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আমাকে বেশ চওড়া মাইনে দিয়ে রেখে দিয়েছে, দেখতেও খারাপ নই, লায়েক বিয়ের পাত্র বলতে যা বোঝায়, তার সবটাই আমার মধ্যে উপচে উপচে পড়ছে। বিয়ের আলাপটা হঠাৎ যে শুরু হয়েছিল তাও না, আরো বছর দুয়েক আগে থেকেই গুঞ্জন উঠেছিল, তখন ক্যারিয়ারের সাত সতেরো দেখিয়ে পাশ কাটিয়েছি অনায়াসেই। কিন্তু এরপর আমাকে চারপাশ থেকে আক্রান্তের চক্রান্ত শুরু হলো। বাবা-মাকে সহজেই কুপোকাত করতে পারি বলে শুরু হলো ফুফু-চাচীদের দিয়ে আক্রমণ। আমার মায়ের ডায়বেটিকস, সেটাকে পুঁজি করে নানারকম 'ইমোশনাল ব্যাকমেইলিং'। ইতিমধ্যে তিন বাসায় গিয়ে মেয়ে দেখে আসাও শেষ। এই চাপ আমি আর নিতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে যখন 'হিস্টেরিক' হয়ে যেতাম, তখন ইচ্ছা করতো উঠে গিয়ে বাবা-মাকে বলে আসি যে আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করি, তোমরা বিশ্বাস করো একটা মেয়েকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারবো না। বিয়ে আমার জন্য ভয়ঙ্কর দুর্বোধ্য একটা জিনিস, আমি বিয়ে করতে চাই না মা!

দূরে একটা শোরগোল দেখা যাচ্ছে, কনে আসছে, এখনই আমার ডাক পড়বে, আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লান্তিকর 'পোজ' দিতে হবে। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে মনে হলো মেয়েটা আগুন কমলা রঙের ঘাঘরা চোলি পরেছে, বেশ মানিয়েছে ওকে। শাহেদের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে থাকলে কি করতো এখন শাহেদ? সবার কাপড়, রঙ আর ফেব্রিক চেনার চেষ্টা করতো? ঘাগরা চোলি তো ওর খুব পছন্দের ছিল, নতুন কোনো ডিজাইন নিয়ে ভাবতে পারতো? বিবিএ-তে ভর্তি হলেও ছেলেটার সব পাগলামি কাপড়, সজ্জা আর তার রঙ নিয়ে। ওর সাথে যতগুলো বিয়েতে গিয়েছি, সবার কাপড় নিয়ে ওর উত্তেজনা দেখার মতো ছিলো। এক প্রকার ওর কারণেই বিয়ের কোনো অনুষ্ঠান 'আনএটেন্ডেড' থাকতো না। এই বিয়েটায় ওর আর আসা হলো না। আমার ছোট্ট বাবুটা!

এখন কি আর আগের মতো যখন তখন ওকে আর বাসায় এনে রাখতে পারবো আমি? রাতের পর রাত ওকে জড়িয়ে কোল বালিশ বানিয়ে আর ঘুমানো হবে না হয়তো। ওর খুব পা নাড়ানোর অভ্যাস ছিলো, ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে পা নাচাতো, কি যে মায়া! শুরুর দিকে ওকে বাসায় আনতে সংকোচ হতো, আমার চেয়ে বয়সে ছোট একটা ছেলে! ওর মায়া মায়া চোখের জন্যেই কিনা জানি না, মা ওকে খুব পছন্দ করা শুরু করলো অল্প দিনের মধ্যেই। ঢাকায় একা থেকে পড়াশুনা করে তাই মা প্রায়ই আমাদের বাসায় এসে ওকে খেয়ে যেতে বলতো। আর আমি চেষ্টা করতাম রাতগুলোতে ওর কাছাকাছি থাকবার!

ছিপছিপে গড়নের টুকটুকে ফর্সা মেয়েটা, মুখে একদম ভারী মেক-আপ নেয়নি, ওর মুখের কোণাতেও কেমন যেন বিরক্তির আভা। আড়চোখে মেয়েটাকে একবার দেখে নিচ্ছিলাম, কি নিষ্পাপ মুখ! এই মেয়েটাকে আমি ঠকাচ্ছি কেন? শুনেছি মেয়েটার বাবা নেই। শাহেদেরও বাবা ছিলো না। একদিন আমার খালি গায়ের উপর উঠে চুমুতে চুমুতে আমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল যখন, হঠাৎ আমার ঘাড়ের কাছে এসে নাক গুঁজে বেশ শব্দ করে ঘ্রাণ নিলো, এরপর বলল, 'তোমার গায়ে কেমন বাবা বাবা গন্ধ! আমার এত ভাল্লাগে!' আমি 'তবে রে শয়তান' বলে ওর ছোট্ট খাটো শরীরটা আমার শরীরের নিচে দলাই মোচড়াই করে ভরে দিয়েছিলাম। এসব ভাবতে ভাবতে চোখের কোণাটা বাষ্পায়িত হয়ে গেল। আমি কি আর কোনোদিন ওর আদর নিতে পারবো?

আমার ঠোঁটের উপর প্রায়ই ঠোঁট রেখে দিতো ছেলেটা, ঠিক চুমু নয়, ঠোঁটের উপর নিশ্চুপ অনড় হয়ে ঠোঁট রেখে দেয়া কেবল। ও আমাকে বলতো, 'শামীম, যার সাথে যা খুশি করো, শুধু এই ঠোঁট জোড়া আমার! তুমি আর কাউকে চুমু খাবে না বলো!'

শাহেদ, বিশ্বাস করো আমি বিয়েটা করতে চাইনি। শুধু তোমাকে ভালোবাসি জন্য নয়, শুধু অচেনা ভিড়-ভাট্টা আর কাগজে 'কমিটমেন্টে'র প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে নয়, আমি বিয়েটা করতে চাইনি এই নিষ্পাপ মুখে আমার পাশে যে মেয়েটা তার পুরোটা জীবন আমার সাথে কাটিয়ে দেবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, ওর কথা ভেবেও। আমার জীবনের এতোবড় একটা বাস্তবতা থেকে ওকে আমি কোন সাহসে বঞ্চিত করবো? বিয়ের পরেও যদি আমি তোমার কাছে যেতে থাকি, সেই গ্লানির বোঝাও আমাকে টানতে হবে। আর সাহস করে ওকে যদি বলেও দিই, ও কেন মেনে নিবে? একসাথে তিনটা জীবনকে দুর্বিষহ করবার কোনো মানে হয়? ■

MOBILE SCANNER

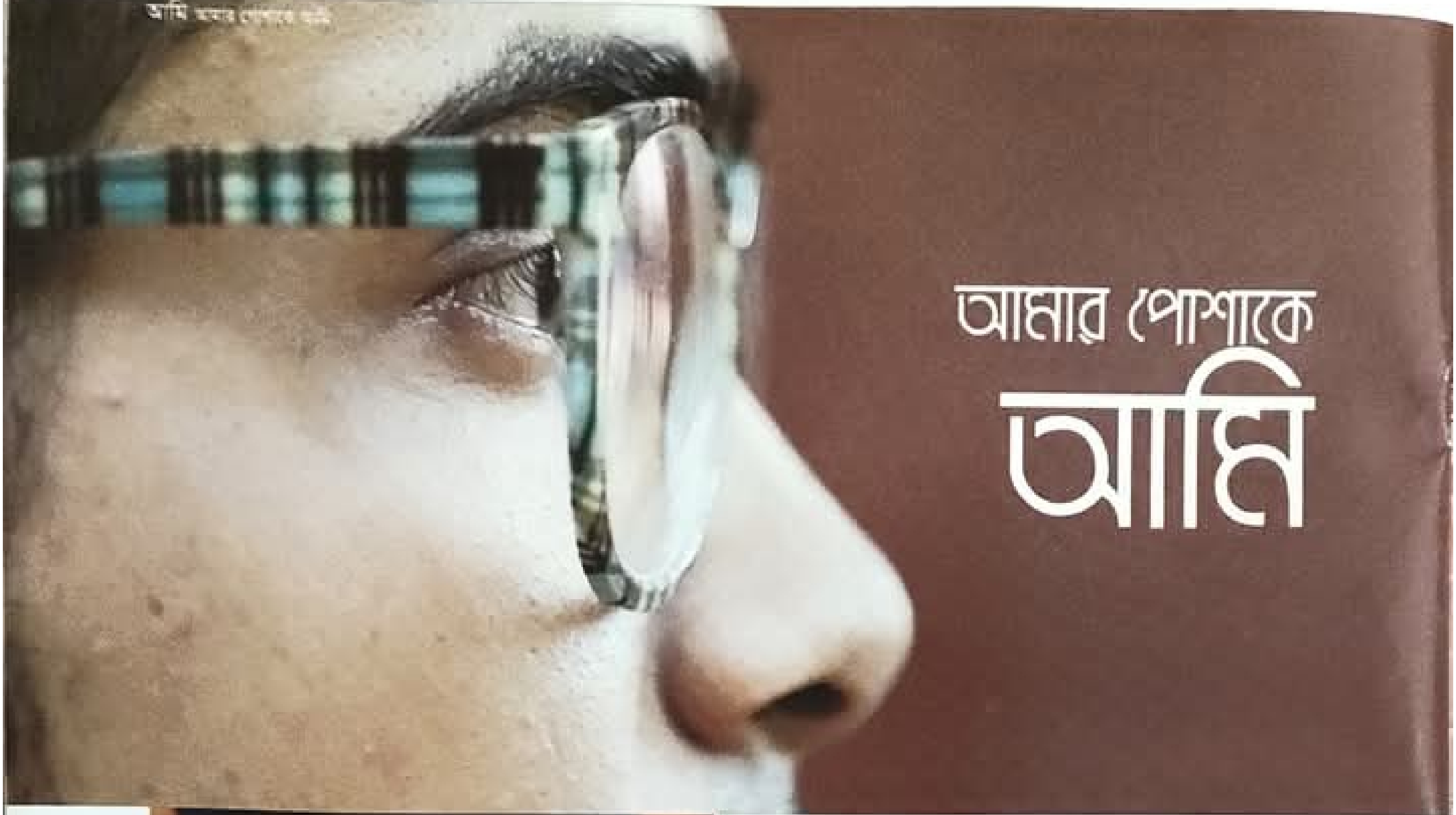

হঠাৎ করেই আমার বন্ধু লাবণ্য-এর বিয়ের অনুষ্ঠান। ভাবছি কি পরে যাওয়া যায়। দিল্লি-এর 'কালচার উইক'-এ সব্যাসাচির লম্বা শেরওয়ানির সাথে মখমলের বিশাল বহরের শালগুলো দেখে কালো মখমল-এর সাথে মরীচা মেরুনের পট্টি দিয়ে একটা শাল বানিয়ে রেখেছিলাম আনেক আগেই। ঠিক করলাম ওটাই জড়াব, শীতের রাতের অনুষ্ঠানে একটা ছোট কূর্তা-এর সাথে যেটাকে পাঞ্জাবি বলেই সবাই চিনবে। রাতের অনুষ্ঠান, মা যাচ্ছেন আমার সাথে কারণ লাবণ্য-এর মা নিজে বাড়িতে এসে মাকে দাওয়াত করে গেছেন। মা পরলেন পুরনো একটা কাতান। সাথে আমি ঘিয়া চুড়িদার-পায়জামা, মটকা সিল্কের হাঁটু অবধি পাঞ্জাবির উপর সেই কালো মখমল-এর শালটি এক কাঁধে করে জমিদারদের আনুকরণে জড়ানো। শহরের এক বিশাল এক হল ঘরে অনুষ্ঠান। আমরা যখন প্রবেশ করছি তখনও বর এসে পৌঁছায়নি। আমি হলের ভেতরে প্রবেশ করবার সাথে সাথেই অনেকে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলো। ঐদিন ওই অনুষ্ঠানে কে কি বুঝেছিলো বা ভেবেছিলো তা বলতে পারব না তবে আমি যে ভীষণ আরামে সগর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেটা বেশ ভালোভাবেই বলতে পারি। কারণ মানুষটা ছিলাম আমি, শরীরটা ছিল আমার, আমাকে উপস্থাপন করবার পুরো বিষয়টাই ছিল আমার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উপর। আমি জানি আমি কোথায় কি কাপড় পরছি , কাপড়-এর সাথে আর কি কি পরছি এবং সেটাকে কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে উপস্থাপন করতে হয়। আমার পরিধেয় হতে হবে আমার নিজের জন্য ,আমার স্বাচ্ছন্দ্য আর রুচির সহিত আমার ব্যক্তিত্বের সঠিক মেলবন্ধন, তবেই না ফ্যাশন! হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা হতে হবে মার্জিত, সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঠিক প্রকাশ। এটাই আমার ভাবনা ,এটাই আমার আমি।

এই যেমন আমার কাজটি সৃজনশীলতার উপর পুরোটাই নির্ভরশীল এবং আমার নিজের ক্ষেত্রটি আমার একান্ত নিজের ভুবন। তাই

Scanned with MOBILE SCANNER

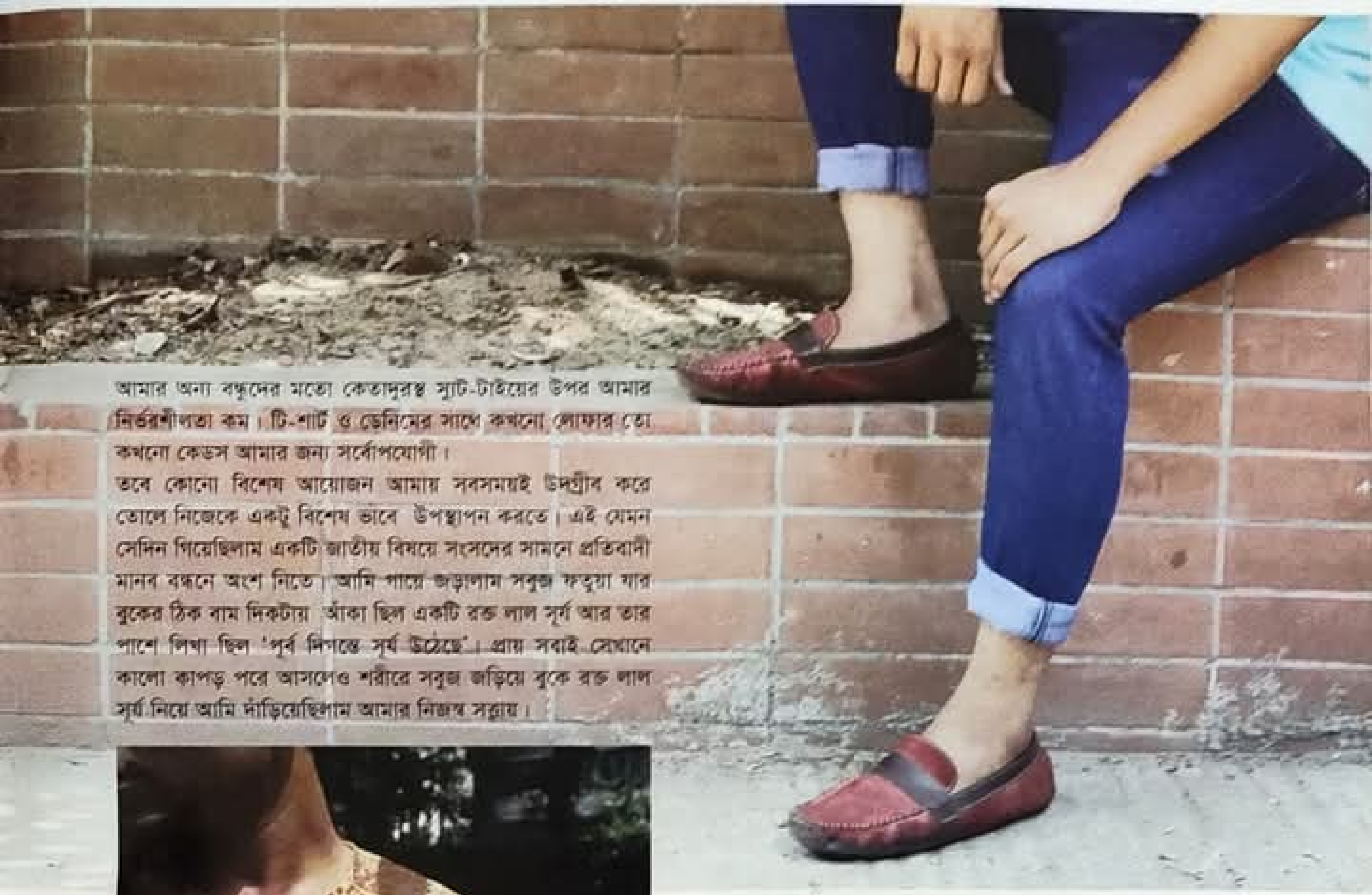

আমার অন্য বন্ধুদের মতো কেতাদুরস্ত স্যুট-টাইয়ের উপর আমার নির্ভরশীলতা কম। টি-শার্ট ও ডেনিমের সাথে কখনো লোফার তো কখনো কেডস আমার জন্য সর্বোপযোগী।

তবে কোনো বিশেষ আয়োজন আমায় সবসময়ই উদগ্রীব করে তোলে নিজেকে একটু বিশেষ ভাবে উপস্থাপন করতে। এই যেমন সেদিন গিয়েছিলাম একটি জাতীয় বিষয়ে সংসদের সামনে প্রতিবাদী মানব বন্ধনে অংশ নিতে। আমি গায়ে জড়ালাম সবুজ ফতুয়া যার বুকের ঠিক বাম দিকটায় আঁকা ছিল একটি রক্ত লাল সূর্য আর তার পাশে লিখা ছিল 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে'। প্রায় সবাই সেখানে কালো কাপড় পরে আসলেও শরীরে সবুজ জড়িয়ে বুকে রক্ত লাল সূর্য নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার নিজস্ব সত্তায়।

আমি চোখে চশমা পরি সেই স্কুল জীবন থেকেই। তাই স্বনির্ভর হওয়ার পর থেকে নিজের পরিধেয়-এর সাথে মিল রেখে হাল-ফ্যাশনের চশমা আমার ভীষণ পছন্দ।

পাদুকার প্রতি রয়েছে আমার বিশেষ দুর্বলতা! পরিবেশ ও পরিস্থিতিনুযায়ী সেন্ডেল অথবা জুতোতে আমার রয়েছে নিজস্ব ধরন। গরমের দিনে দু-ফিতে সেন্ডেল অথবা লোফার, শীতের সময়ে আঁটোসাটো কেডস আথবা পম্পিনা জুতোতে রয়েছে আমার নিজস্ব রুচির বহিঃপ্রকাশ।

এই গরমে রঙগুলো হতে হবে হালকা যেমন সাদা কিংবা যেকোনো রঙের হালকা ধরন। তবে রাতে যেকোনো ভারিক্কী অনুষ্ঠানে কালো রঙ আমার একান্তই ব্যক্তিগত দুর্বলতা। তাই বলে যে আমি অন্য রঙ-এ স্বচ্ছন্দ্য নই তা নয়। স্বভাব সুলভ রঙই আমার পছন্দ। যেমন বর্ষাতে আমার ভীষণ পছন্দের রঙ নীল, সাথে সাদাও থাকে। বর্ষা-এর সময় আমি ঘুম থেকে উঠে সবসময়ই আকাশ দেখে সেভাবে নিজেকে তৈরী করে ঘর থেকে বেরোই। বর্ষা এবং শীত-এর মাঝের সময়টা যেমন শরতে সাদা অথবা যেকোনো হালকা রঙ কিংবা সুতির যেকোনো কাপড় দিনের বেলাটাকে আরামদায়ক করে রাখে। হেমন্তে হলুদ আথবা হলদেটে সোনালি রঙ-এ আমার আসক্তি। ঋতুরাজ বসন্তে যেমন যেকোনো রঙ মনে হয় মনটাকে সবসময় প্রফুল্ল করে রাখে। আর এ ছাড়া পালা পার্বণ তো আছেই। নিতান্ত সাধারণ একটা ছেলে আমি, ফ্যাশন নিয়ে বাড়াবাড়ি না করেই প্রচলিত রীতির সাথে রুচির সমন্বয়ে এই হলো আমার সাধারণের ফ্যাশন। ■

Scanned with CAMSCANNER

টার্ন অফ

আমি জানতাম রাফি ঢাকার বাহির থেকে আজ রাতে আসবে কিন্তু আসতে যে এত রাত হবে আমার ধারণা ছিল না। রাত ১১টার দিকে ফোন পেলাম, 'কই তুমি?' এই বাজে প্রশ্নটা করার অভ্যাস আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি। রাত ১১টার সময় আমি কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে থাকি কিংবা দোলনায় বসে দোল খাই, তাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির কি আসে যায়? যত্তসব অর্থহীন মুদ্রাদোষ। রাফির আসতে আরো ঘন্টাখানেক সময় লাগবে। ততক্ষণে ওর বাসায় গেইট বন্ধ হয়ে যাবে। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললাম, 'তুমি চাইলে আজ রাতে আমার বাসায় থাকতে পার।'

রাফির সাথে আমার পরিচয় ছয় মাসের। দেখা হয়েছে কেবল একবার। বন্ধুদের আড্ডায়। তাও সামনাসামনি কথা হয়নি। চাপা গায়ের রঙ, চশমা পরে। ছোট ছোট করে চুল ছাটা। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়ার কারণেই হয়ত কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ (বাক্য নয়) বলার একটা বাজে অভ্যাস আছে। কিন্তু উচ্চারণ পরিষ্কার। শুনতে ভালোই লাগছিল। গাঢ় বেগুনি একটা শার্ট পরেছিল। দেখতেও ভালো লাগছিল। কাছে যাবার পর খেয়াল করলাম সবগুলো বোতাম কাঠের হলেও কলারের কাছেরটা প্লাস্টিকের। বোধহয় হারিয়ে গেছে। তাই আর কষ্ট করে আরেকটা এক রকম বোতাম কেনার তাগিদ বোধ করেনি। এই ছোট ছোট পাশ কাটিয়ে যাবার ব্যাপারগুলো আমাকে খুবই পীড়া দেয়। সুন্দরভাবে নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য তো খুব বেশি কিছুর দরকার নেই আসলে।

> ওর আর্থিক অবস্থা এত খারপ নয় যে আমি বলব ওর একটাই শার্ট। অভ্যাস। নিশ্চয় একই শার্ট প্রতিদিন এক জায়গায় খুলে রাখে, পরদিন আবার সেখান থেকে ঐ একই শার্ট পরে।

রাফির সাথে অনলাইনে কথা বলতে ভালোই লাগত। কম্পিউটারের কি এক বিদেশি কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে ও। খুব গুছিয়ে কথা বলে। দরাজ গলার স্বর। আগে রক গান করত। কেবল একটা জিনিসই আমার ভালো লাগেনি, প্রতিদিন রাতে তার এক পেগ হলেও চাই-ই চাই। আমার নিজেরও অল্প বিস্তর অভ্যাস আছে, অনুষ্ঠানগুলোতে গেলে খাওয়া হয়। কিন্তু না খেলে চলবে না এমন নয়। অর্ধ মাতাল লোকদের দেখতে বা সাথে কথা বলতে কেন যেন ভালো লাগে না আমার।

রাফি বেল দেবার আগেই দরজা খুলে দিলাম। কোথাও হয়ত লুকনো আগ্রহ জমা করা ছিল। ও আসবার আগে ঘরে ধুপের ২টা কাঠি জ্বালিয়েছিলাম। এই ধুপ কাঠি অনেক কষ্টে সগ্রহ করা। ছোট চাচাকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনানো। তাও একবারে আনেননি তিনি। দুইবার বলার পর দোকানের ঠিকানা চাইলেন। তারপর এই ধুপ কাঠি। বারান্দার সামনে কদম ফুলের গাছ থেকে

Scanned with MOBILE SCANNER

২টা ফুল ছিঁড়ে একটা কাঁচের গ্লাসে ভিজিয়ে বিছানার পাশে রাখলাম।

কিন্তু নিমিষেই কপালটা কুঁচকে গেল আমার। মনের অজান্তে। রাফির মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শেভ করেনি আজ। গালের পাশে কয়েকটা দাড়ি সাদা। রাফি সেই বেগুনি শার্টটাই পরা। রংটা জ্বলে গেছে। আগের প্লাস্টিকের বোতামের জায়গায় আরেকটা প্লাস্টিকের বোতাম। এবার কাঠের বোতামের সাথে রঙ মিলিয়ে কেনা কিন্তু কাছ থেকে খেয়াল করলে ঠিক ধরা যায়। প্লাস্টিকের ভিতরে অস্তিত্ব জাহির করবার একটা চকচকে ব্যাপার আছে যা চোখে পীড়া দেয়। অন্য কারো না দিলেও আমাকে দেয়। ওর আর্থিক অবস্থা এত খারপ নয় যে আমি বলব ওর একটাই শার্ট। অভ্যাস। নিশ্চয় একই শার্ট প্রতিদিন এক জায়গায় খুলে রাখে, পরদিন আবার সেখান থেকে ঐ একই শার্ট পরে নেয়। আমি ছোট একটা শ্বাস ফেললাম। মোজার বিশ্রী গন্ধে আমার ঘর ছেয়ে গেল। ধুপের কাঠি দুইটা শেষ হয়ে আসছিল। তারাও হয়ত পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল।

রাফি বাহির থেকে খেয়ে এসেছে। খাওয়ার পরে বোধহয় স্যার ভালোমন্দ কিছু সেবন করেছেন। মুখ থেকে গাঁজার গন্ধ আসছে। আমি মাঝে মাঝে ভেবে পাই না, মানুষ কেন নেশা করে? বদলে নেবার জন্য কাপড় লাগবে কিনা জানতে চাইলে সে বলল, লাগবে না। ব্যাগ থেকে পুরনো ময়লা একটা কটকটে হলুদ চেকের গামছা (আধ ময়লা) আর একটা দুমড়ানো ফতুয়া বের করে পরে নিল। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে গেলাম। একটু গুছিয়ে থাকা কি খুব কঠিন ব্যাপার?

খেয়াল করে দেখলাম, রাফির সবগুলো নখ কাটা থাকলেও একটা নখ বড়। কি কুৎসিত! সেই নখের ভিতরে ময়লা জমে আছে। বোঝাই যাচ্ছে খাবার পর হাত ঠিকমত ধোয়া হয়নি। দুই চুমুক মুখে নিয়ে রাফি কাপড় বদলাতে বাথরুমে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, চা পাওয়া যাবে কিনা।

রাফির কাপড় পালটে আসতে অনেক সময় লাগল। বাথরুম থেকে সে বের হল কান চুলকাতে চুলকাতে। আমি নিশ্চিত এই হাত সে আর ধুবে না। আমি রাফির জন্য চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় বসলাম। আমার আগেই দাঁত ব্রাশ করা হয়ে গেছে বলে আর চা নিলাম না। রাফি সিগারেট ধরালো। একটার পর একটা। আমি এশট্রে এনে দেবার পরও ক্রমাগত ছাই ফেলতে লাগল আমার শখের ফুলের টবে। সিগারেট শেষ করে ওটা টবেই পুঁতে ফেলল আমি কিছু বলার আগেই! গাছের চারাগুলো নতুন কেনা। মাত্র বিকেলে আমি মাটি নরম করে দিয়েছি। কয়েকটা গাছে ছোট ছোট ফুল এসেছে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলাম।

যারা বেশি কথা বলে, তাদের একটা বাজে অভ্যাস হল কথা বলবার সময় অন্যকে সুযোগ না দেয়া। কিংবা অন্যকে তার মতামত জিজ্ঞেস না করা। আমি বুঝতে পারলাম রাফির মধ্যে এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বিদ্যমান। কথা বলতে বলতে রাফি ঘনিষ্ট হয়ে আসতে চাইল। আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। চা খাওয়া হয়েছে। যারা সিগারেট খায় চায়ের সাথে সিগারেটের গন্ধ মিলে তাদের মুখে একটা অন্যরকম বিদঘুটে গন্ধ তৈরি হয়। আমি একটু পেছনে সরে বসলাম। আসলে রাফিকে রাতে থেকে যেতে বলাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। নিজের উপর খুব রাগ লাগতে লাগল।

বারান্দাতে কিছুক্ষণ কথা বলে এবার আমার জলাধার খালি করবার প্রয়োজন পড়ল। গিয়ে দেখি সারা বাথরুম চপ চপ পায়ের ছাপ। কাদা। আমি ভেজা বাথরুমে যেতে পারি না। এবার গোসলের হ্যান্ড শাওয়ারটার দিকে তাকিয়ে দেখি ওটার উপর রাফির সস্তা লালচে স্ট্রাইপের আন্ডারওয়্যারটা। আমার মাথা ঘোরা শুরু করলো। একটা ফুটোও আছে দেখতে পাচ্ছি! মানুষের রুচিবোধ এত খারাপ হয় কেমন করে? সারা বাথরুমে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। আমার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। কমোডে দুইটা সিগারেটের টুকরো ভাসছে। আমার বুঝতে বাকি রইল না, রাফিও সেই সব লোকদের মধ্যে একজন যাদের সিগারেট ছাড়া বাথরুম হয় না। আর সেই সিগারেটের টুকরোটা কমোডেই কেন ফেলতে হবে? ঈশ্বর!

বারান্দায় আসার পর কথা বলতে বলতে হঠাৎ রাফির যেন কি মনে পড়ে গেল। ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়ানো কি যেন এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, আমার জন্য সামান্য উপহার। হ্যাঁ! আমার জন্য উপহার পলিথিনেই হতে হবে? না হোক হ্যান্ড মেইড পেপার, খবরের কাগজে মুড়িয়ে তো উপহারটা দেওয়া যেত। কিংবা ব্রাউন পেপার। পলিথিন খুলে দেখি রাবার জাতীয় কাপড়ের দুটো মেরুন

রঙের গোলাপ ফুল। বিকট তার আকৃতি, বিচিত্র্য তার রঙ। মোম দিয়ে তার উপর বিন্দু বিন্দু শিশির কণা জমা করা। নিজের উপর খুব রাগ লাগছিল। এই মানুষটার জন্য আমি রাতের বেলায় কদম ফুল ছিঁড়ে বিছানার পাশে রেখেছিলাম।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হেসে ফেললাম। ছোট বেলায় পড়েছিলাম 'অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে মানুষ পাথর।' আমার মনে হলো হাসতে হাসতে আমার পাথর ফেটে রাফির উপর যাবতীয় রাগ গলে জল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি বুঝতে পারলাম, রাফি হয়ত অনেক সুন্দর করে কথা বলে, অনেক ভালো একটা চাকরি করে কিন্তু রাফির জন্য আমি কিংবা আমার জন্য রাফি নয়। আমার ভালো লাগল এই ভেবে যে এই সত্যটা অনুধাবন করতে অনেকের হয়ত অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিছু দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখা আর দুইটা শখের ধুপকাঠি ছাড়া আমার তেমন কিছুই পোড়াতে হয়নি। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

পঞ্চাশের পর . . .

এক বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে ভাবনাটা প্রথম মাথাচাড়া দেয় আমার। অনুষ্ঠানের নাচ-গান আর নানা আয়োজনের ফোকর গলে সবকিছু থেকে একটু দূরে বসে থাকা একজন আপাত একাকী লোক আমার নজর কাড়ে। উনার বয়স পঞ্চাশের কম মনে হচ্ছে না, মাথায় চুল না থাকলেও শরীরের মেদের কোনো অস্তিত্ব দেখলাম না। একটা হাওয়াই শার্ট আর ব্লু জিন্সে বেশ মানিয়েছে। চকিতে মাথায় কতগুলো জিনিস খেলে গেল। অন্যের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখাটা কমবেশি অনেকেই হয়তো চর্চা করে, কিন্তু আমাদের মতো 'রিপ্রেসড্' এবং অগ্রহণযোগ্য একটা 'কমিউনিটি' এর জন্য, যেখানে বন্ধুত্ব কিংবা ভালোবাসার মত সম্পর্কই স্পষ্টভাবে ডালপালা মেলতে পারে না, সেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের প্রতি সবার মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু বার্ধক্য আর জরা তো অপ্রতিরোধ্য, এই বাস্তবতা ক্ষমাহীন। এই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যকেন্দ্রিক দুষ্টচক্রে বয়স কি কেবল খলনায়কের চরিত্রেই রূপদান করে? সমপ্রেমী রূপবানেরা যখন তাদের মধ্য-বয়সে পৌছান, সেটা কি আসলেই অতটা বিভীষিকাময়?

প্রজ্ঞা

বয়স পঞ্চাশ পেরোলেই যে রূপবানেরা হা হুতাশ করে মরে যাচ্ছে, চিত্রটা মোটেই সেরকম নয়! এই বয়সের মানুষের সাথে কথা বলে প্রথমেই যে আশাব্যঞ্জক চিত্রটি ফুটে উঠলো, তা হলো এই বয়সের প্রজ্ঞার আভিজাত্য! অর্ধেক বয়স জুড়ে বছরের পিঠে বছর জমে অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার যে পাহাড় এ সময়ে জমে, জীবনকে আরো বাস্তবতার নিরিখে দেখতে তার কোনো জুড়ি নেই! অনেকেই বলেছেন তারুণ্যে নিজের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের যে দোলাচল ছিল তার পুরোটাই বয়স বাড়ার সাথে সাথে কেটে গেছে। নিজের চাহিদা এবং জীবনের প্রতি তাদের এখন অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং দৃঢ় ধারণা রয়েছে।

তারুণ্য

শরীরের বয়স বাড়লেও মনের বয়স বাড়াতে হবে এমন তো কোনো আইন নেই। মন খুলে এই বয়সেও তাই অনেকে উপভোগ করেন তারুণ্য। 'ফোর্টি ইজ দ্যা নিউ থার্টি' স্লোগানের সাথে আজ অনেক রূপবানই একাত্ম। আমাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে পঁয়তাল্লিশে পড়া জামাল বললেন, 'আমি তো টি-শার্ট আর জিন্স পরতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমার বন্ধুদের মধ্যে বেশিরভাগই আমার চেয়ে কম বয়েসী হলেও আমি ওদের চেয়ে বড় সেরকম কিছু তো মনে হয়না আমার।' জয় বললেন, 'আমাদের রূপবানদের মধ্যে অধিকাংশই আসলে মনের দিক দিয়ে একদম শিশু থাকতে পছন্দ করে, আমরা চাইলেও বুড়ো হতে পারবো না!'

সঙ্গী

যারা বিয়ে করেননি এবং একই সাথে কোনোরকম সম্পর্কে জড়াননি, তাদের জন্য এই বয়সে সঙ্গী খুঁজে পাওয়াটা খুব দুঃসাধ্য মনে হয় আপনার কাছে? অপেক্ষা করুন হাই ভোল্টেজ চমকের। রূপবানের সাথে কথা বলা বেশির ভাগই বললেন তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে উপভোগ্য সঙ্গীর সন্ধান এই বয়সেই পেয়েছেন। বয়ঃসন্ধি কিংবা পূর্ণ তারুণ্যে অনেকেই তার প্রকৃত পছন্দের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত থাকেন। 'ওরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়' বয়সটা পেরিয়ে মধ্য-বয়সের দিকে অগ্রসর হবার সাথে সাথে নিজের চাহিদা আর আকাঙ্ক্ষার মানুষকে চিনে নেয়া অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। 'আমার বুদ্ধিমান আর প্র্যাক্টিকাল ছেলে ভালো লাগে, বয়সের সাথে সাথে আমি বুঝে গেছি কাদের সাথে সময় কাটালে আসলেই 'কোয়ালিটি টাইম' কথাটা 'জাস্টিফাইড' হবে', জানাচ্ছিলেন জয়।

যৌনজীবন

এই বয়সে অনেকেরই যৌনতার প্রতি আগ্রহ পড়তির দিকে থাকলেও অনেক তরুণেরাই পছন্দের সঙ্গী হিসেবে এই বয়সটাকে পছন্দ করেন। আটাশে পড়া রাজুর কাছে এই বয়েসী লোকেদের সঙ্গ কি অঙ্গ দু-ই অধিক পছন্দের।

থিতু হই

সারাজীবন চরকির মতো অনেক ঘুরপাক খেয়ে এই বয়সে এসে থিতু হতে চান অনেকেই। কেবল থিতু হতে চাইলেই তো হয় না, সেই জন্য উপযুক্ত স্থির মানসিকতারও দরকার পড়ে। পঞ্চাশের গোড়ায় এসে অনেকেই সেই মানসিক স্থিরতার সন্ধান পান। জীবন নিয়ে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে ভাববার শক্তি অনেকে এই বয়সটার কাছেই পান।

অফিস

আর সমপ্রেমী হয়েছি বলে কি শুধু প্রেম নিয়েই পড়ে থাকতে হবে? বাস্তবিক জীবনে চাহিদার কি কোনো শেষ আছে? অনেকের মূল চিন্তাজুড়ে তাই তার পেশাগত জীবন, অফিস কিংবা পড়াশোনা স্থান করে নিয়েছে। কাকে পেলাম কাকে পেলাম না সেই হা-হুতাশের চাইতে জীবনকে ব্যস্ত করে তোর অনেক অনুষঙ্গই তাদের রয়েছে।

চল্লিশ পেরোচ্ছেন? বয়স নিয়ে বাড়াবাড়ি দুশ্চিন্তায় আছেন? ভাবছেন পরের জীবনের একাকীত্বে কাউকে পাশে পাবেন না? একটু দম নিন, আপনি চাইলে সবই সম্ভব। সমপ্রেমী রূপবান হয়ে এতোদিন পর্যন্ত আপনাকেই সামাল দিতে হয়েছে পুরোটা, বয়সটাকে তাই চাপ না ভেবে উপভোগ করুন, দেখবেন আরেকবার [illegible] হয়েছেন আপনি। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

স্থূল আমি

আমি মোটা, আমি জানি আমার পেটে আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অধিক পরিমাণে চর্বি স্তূপাকারে জমে আছে। খুব ছোটবেলা থেকেই আমার এই স্থূলাকার নিয়ে আমি বিব্রত হতে শুরু করি। স্কুলে থাকতে প্রায়ই 'ময়দার বস্তা' জাতীয় উপাধি কপালে জুটতো, ইতস্ততায় পূর্ণ বয়ঃসন্ধিতে এরকম কথা শুনে চোখে পানিও এসেছে অনেকবার। প্রত্যেক বছর রোজার সময়টায় ভাবতাম, এক মাস না খেয়ে এবার বোধহয় শুকিয়ে যাবো, মাস শেষে উলটোটাই হতো বলা বাহুল্য। ধীরে ধীরে কৈশোর পেরোচ্ছি যখন, টের পাচ্ছি আমার চাহিদার ভিন্নতা। অরণী নামে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা মেয়ে থাকতো, মেয়েটাও আমার মতো একটু মোটা হওয়ায় ওর সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল আমার। সতেরো বছর বয়সে এসে ঐ মেয়েটার প্রতি নিজের মধ্যে জোর করে আকর্ষণ তৈরির চেষ্টা করতাম, কিন্তু সেই আকর্ষণ ওর সুদেহী বড় ভাইয়ে গিয়েই থামাতো সব সময়। সেই বয়স থেকেই জানি যে, আমার ভালো লাগা ভিন্ন, আমার আকর্ষণ ভিন্ন। পুরুষালী পেলব-সুঠামো শরীরের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন যতো বাড়তে থাকে, পাল্লা দিয়ে বাড়ে নিজের উৎকট মোটা শরীরের প্রতি বিতৃষ্ণা। মানুষ আকর্ষণের সংজ্ঞাটা হয়তো নিজের শরীর দিয়েই সবার প্রথমে সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে মানুষের সাথে পরিচয়ের গন্ডি বাড়তে থাকে। আমি আমার পছন্দের লোকদের সাথে চলতে-ফিরতে শুরু করি। ত্রিশের কোটা পূর্ণ করতে চলা এই রূপবান জীবনে অসংখ্য অভিজ্ঞতায় পড়তে হয়েছে আমার। মোটা হবার কারণে কেউ কেউ শুরুতেই বাতিল করে দিয়েছে আমাকে, কিছু মানুষের পছন্দের শরীরে পরিণত হয়েছি আবার অনেকেই আমার ভিতরের আমিটাকেই গুরুত্ব দিয়েছে আমার চর্বিজাত শরীরটার প্রতি কোনো আগ্রহ না দেখিয়েই। তবে যে যেরকমই ভাবুক, এই অস্বস্তিকর আকৃতি নিয়ে আমি কোনোকালেই সুখী হতে পারিনি, তবে আমার স্থূলতা যাদের বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দুতে, তাদেরকে কিছু কথা জানাতে চাই আজ আমি!

মোটা বলতে শুরুতেই চোখে ভেসে ওঠে এমন একজন মানুষ যার আত্মনিয়ন্ত্রণ শূন্যের কোঠায়। অনেক স্থূলকায় লোক নিজেরাও এটা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তার শরীরের এমতাবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। এই বিশ্বাস অনেকটা সময় তার আত্মবিশ্বাসেও ধ্বস নামাতে পারে।

প্রথমেই বলে রাখি খাবার প্রতি আমার বাড়াবাড়ি কোনো লোভ নেই। টেবিলে খাবারের বাটি আছে বলেই সব বাটি থেকে খাবার তুলবো, সেরকমটা নই আমি। আমার খাবারের তালিকায় কার্বোহাইড্রেটের বাড়াবাড়ি আছে তাও না। তবুও আমার পেটের এমন বেঢপ আকারের কারণটা কি? আপনার প্রধান কারণটাও কিন্তু আমার মতো জেনেটিক হতে পারে। আমার প্রায় সাড়ে চার শ পাউন্ডের বাবা কিংবা অনেক মোটা মায়ের মায়েরাও যথেষ্ট ফোলা-ফাঁপা ছিলেন। মানুষের উচ্চতা নির্ণয়ে যেমন বিশের অধিক জিনের ভূমিকা থাকে তেমনি পারিবারিকভাবে আসা 'ফ্যাট-জিন' প্রসঙ্গটি এখন কমবেশি সকল চিকিৎসাবিদদের জানা। জিনগত কারণে পরিবার থেকে কেউ যেমন লম্বা শরীর, সুঁচালো নাক কিংবা চওড়া কাঁধের অধিকারী হতে পারে তেমনি শরীরের 'ফ্যাট-সেলে'র আধিক্যের কারণটাও হতে পারে পারিবারিক জিন! অনেক সময় একজন মোটা মানুষের চেয়ে অনেকাংশে অধিক খাদ্য গ্রহণ করেও একজন চিকন লোকের স্বাস্থ্য না বাড়ার পেছনে এর কারণ রয়েছে। তবে এটাকে কারণ ভেবে হাল ছেড়ে দেয়াটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটা শরীর আরো মোটা হবার কারণে পরিণত হতে পারে। পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত এই জীনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আপনাকেই!

আমি খাই, এর জন্য মোটা নাকি মোটার জন্য খাই? এক্ষেত্রে জনপ্রিয় মতবাদগুলো কিছুটা থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র মেনে চলে। যে পরিমাণ শক্তির প্রবেশ শরীরে ঘটে ঠিক সেই পরিমাণ যদি 'বার্ন' না হয় তবে সে শক্তি চর্বির রূপ নিয়ে শরীরের তলদেশে স্তূপ জমাতে থাকে। সোজা কথায় ক্যালরির ভারসাম্য রক্ষা জরুরি। উপায় আছে দুটো, হয় পরিমিত ক্যালরি গ্রহণ আর নয়তো অতিরিক্ত ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলা! এসব তো কমবেশি সকলেই জানি! তাহলে নতুন কথাটা কি? বলছি শরীরের ফ্যাট টিস্যুর কথা, শরীরটা যতো বাড়বে, শরীরে ফ্যাট টিস্যুর আধিক্যও বাড়তে থাকে, আর ফ্যাট টিস্যুগুলোর ক্যালরি শোষণ ক্ষমতা শরীরের অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি হওয়ায় আপনি যখন পেট পুরে খাবেন তখনও আপনার শরীরের স্বাভাবিক টিস্যুগুলো অভুক্ত থেকে যায়, যার কারণে খাবার পরেও আরো খাবার তৃষ্ণা থেকে যায়। এছাড়াও শরীরে কিছু নির্দিষ্ট হরমোন এবং ব্যাক্টেরিয়া থাকে যার প্রভাবে অনেকের স্বাভাবিক কোষগুলোর ক্যালরি শোষণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। অনেকের খাদ্য হজম প্রক্রিয়াও স্বাভাবিকের চাইতে দ্রুত, এক্ষেত্রে তার শরীরের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশিই থাকে। তবে চিরায়ত সত্যটার কোনো বিকল্প আজও নেই আর সেটা হচ্ছে শারীরিক কসরত! 'ক্যালরি-কিলার' হিসেবে এর চেয়ে ভালো কোনো প্রতিস্থাপক আজও আবিষ্কার হয়নি।

অন্যদের চাইতে আমরা রূপবানেরা শরীর নিয়ে কিছুটা বেশিই মাথা ঘামাই, এই ব্যাপারে আমি নিঃসন্দিহান। তবে এক্ষেত্রে বিষন্নতায় না ভুগে ছোট-ছোট কিছু নিয়ন্ত্রণ আপনাকে ঝরঝরে শরীরী অনুভূতি দিতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাচারণ, অধিক ঘুম কিংবা অলসতার মতো ছোটখাটো জিনিসগুলি ত্যাগ করে আপনার পরিবর্তন আপনি নিজেই আনতে পারেন। আমিও সেই চেষ্টাই করছি!

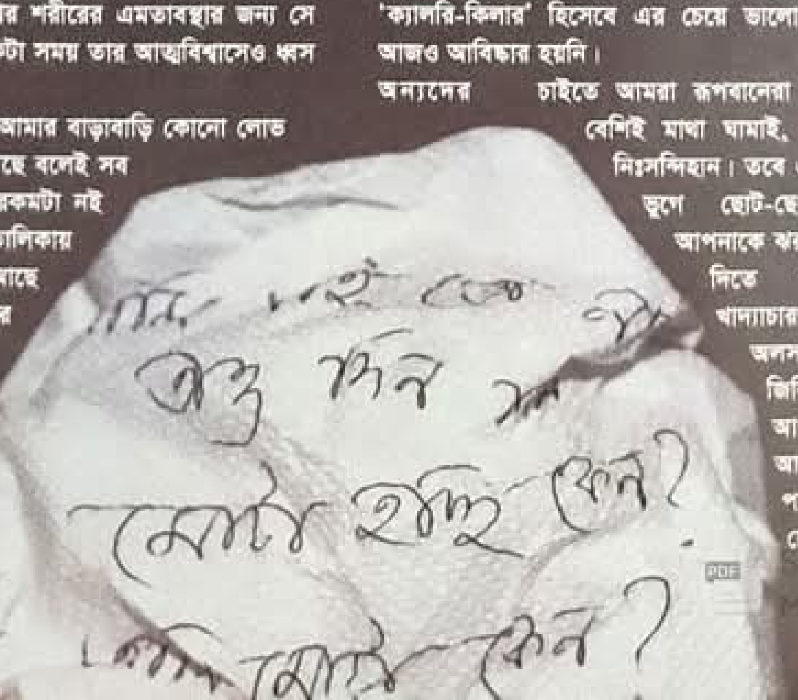

Scanned with CamScanner

কনডম কনডম!

ধরুন রাতটা মধ্যভাগে পৌঁছে গেছে, আপনি সিএনজি-তে করে বাসায় ফিরছেন। আপনি কেবল পঁচিশে পড়া টগবগে যুবক, গায়ে জড়ানো সুতির নীলচে স্ট্রাইপের শার্টটা কালো প্যান্টের ভিতরে পরিপাটি করে গোঁজা, চোখে পাওয়ার ওয়ালা চশমা, ল্যাপটপের ব্যাগটায় আসুসের আনকোরা মডেলের নোটবুক পিসি, পকেটের ওয়ালাটে বেশ কিছু টাকা, খুচরো কয়েন আর দুটো কনডম!

কনডম? আঁতকে উঠলেন তো? মানিব্যাগে টাকা থাকতে পারে, দরকারি কাগজপত্র কিংবা ভিজিটিং কার্ড থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে একেবারে কনডম?

আপনিই যদি এভাবে আঁতকে ওঠেন তবে একবার ভাবুন পুলিশের আঁতকে ওঠাটা কতটা স্বাভাবিক হতে পারে। রাত একটায় সিএনজি-টা থামল গুলশান লেকের ব্রিজটার উপর বসানো চেকপোস্টে। আপনাকে দেখেই ধারণা করে নেয়া হলো শিক্ষিত, ভদ্র ঘরের ছেলে, তবুও সিএনজি যখন থামলই, চেকিং তো নিয়ম মেনে করতেই হয়। ঢিলেঢালাভাবে এটা ওটা চেক করতে করতে মানিব্যাগ থেকে বেরিয়ে এলো একজোড়া কনডম! সাথে সাথে পুরো বাহিনী সজাগ!

চারকোণা প্লাস্টিক প্যাকেট। তাতে গুটিয়ে থাকা ল্যাটেক্স জিনিসটা। কতরকমের গন্ধ আর বর্ণের যে হতে পারে! অথচ একটা সময় প্রাণীর 'ইনটেসটাইন' ব্যবহার হতো এই কাজে, সেও ১৭০০ কি ১৮০০ শতকের সময়টাতে। নিশ্চয় ভাবছেন আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করে কি বাঁচাটা বেঁচে গেলেন। রাবার জাতীয় বস্তু পাচ্ছেন প্রাণীর দেহাংশের পরিবর্তে।

কিন্তু আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ কি আপনাকে বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দেবে? মধ্যযুগের রক্ষীরা 'ইনটেসটাইন' হতে তৈরি কনডমের বহনে জেরার পর জেরা করতো নাকি আমার জানা নেই। তবে আজকের দিনে, মানে আজকের দিনের কোনো এক রাতে যদি আপনার পকেটে আধুনিক পন্থায় প্রস্তুত কনডম থাকে আর পুলিশ আপনার দেহ তল্লাশি চালায়, তবেই কিন্তু হয়ে গেলো! সেক্ষেত্রে এরকম একটা কথোপকথনের অভিজ্ঞতা হতে পারে আপনারও:

-কি করেন?

-পড়ালেখা শেষ করেছি।

-বয়স কত?

-২৫।

-যাচ্ছেন কোথায় এতো রাতে?

-বাসায়!

-বাসা কোথায়?

-মিরপুর

-গুলশানে এতো রাতে কি করছেন?

-বন্ধুর বাসায় এসেছিলাম।

-কনডম নিয়ে বন্ধুর বাসায় কি?

-বন্ধুর জন্মদিন ছিল।

-বিয়ে করছেন?

-না।

-বিয়ে না করলে কনডম দিয়ে কি করেন? খারাপ অভ্যাস আছে নাকি?

-কনডম সাথে রাখাটা কি বেআইনি?

-পকেটে কনডম আবার বড় বড় কথা! বউ না থাকলে কনডম রাখবেন কেন?

-আশ্চর্য! যেটা বেআইনি না সেটা নিয়ে এতো কিছু জিজ্ঞাসা কেন?

-কনডম রাখছেন। সাথে ইয়াবা টিয়াবা আছে নাকি?

-খুঁজে তো দেখলেনই, পেলেন না তো তেমন কিছু।

-কিন্তু কনডম দিয়ে কি করেনটা কি? বন্ধুর জন্মদিনে কনডম গিফট দিতে আনছিলেন নাকি?

এই কথোপকথন আরো কিছুক্ষণ চলতে পারে। জেল-হাজত পর্যন্ত গড়াতে পারে যদি একটু গোঁয়ারগোবিন্দের মতো আচরণ করেন কিংবা পুলিশটি যদি একটু রগচটা হয়। ভাবছেন এতো ঝামেলার কি দরকার, কনডম নিয়ে ঘোরাফেরা না করলেই হয়। কিন্তু যৌন ঝুঁকি কি বলে কয়ে তৈরি হয়? বিবাহিত হলে তো বেঁচে গেলেন, বলে দিতে পারেন বউ আছে। ক্ষেত্র বিশেষে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়। যদি হন সমপ্রেমী? তাতেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন। ঝামেলায় পড়বেন কম বয়সী হলে। মানে বয়স যদি ২৫/২৬-এর কম হয়।

কেউ কেউ এখনো ভাবছেন কনডম পকেটে নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল কেন পঁচিশ বছরের যুবকটি? হতে পারে তার ছেলেবন্ধু কিংবা মেয়েবন্ধু আছে, হতে পারে নেই। হতে পারে উনি একগামী, হতে পারে বহুগামী। অনেকে অভিযোগ করতে পারেন কনডম ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু তাতে অবাধ যৌনাচারকে কিছুটা উৎসাহও দিচ্ছেন। সেই সব ব্যক্তিদের জন্য বলবো, আপনার যৌন আচরণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা সম্মতিপূর্বক হচ্ছে। সেটা নিয়ে ঘাটবার অধিকার যেমন আমার নেই তেমনি পুলিশেরও থাকা উচিত না। এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন কেউ নিজ স্ত্রী কিংবা মেয়েবন্ধু কিংবা পরিচিতদের সঙ্গে থাকাকালীনও হতে পারেন। সেটা কি পরিমাণ বিব্রতকর হবে আপনার জন্য ভেবে দেখুন একবার।

বেআইনি কিছু না করলেও এ দেশে জ্বালা পোহাতে হয় অনেক ক্ষেত্রেই। পঁচিশ বছরের সেই যুবকটি পার পেয়ে গিয়েছিল ডাক্তারি পড়েছিল সেই সুবাদে, সকলের তো আর ডাক্তারি পড়ার সৌভাগ্যটি হয় না। তাই সাবধানে চলাফেরা করুন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী উপস্থিত বুদ্ধি খাটান। ■

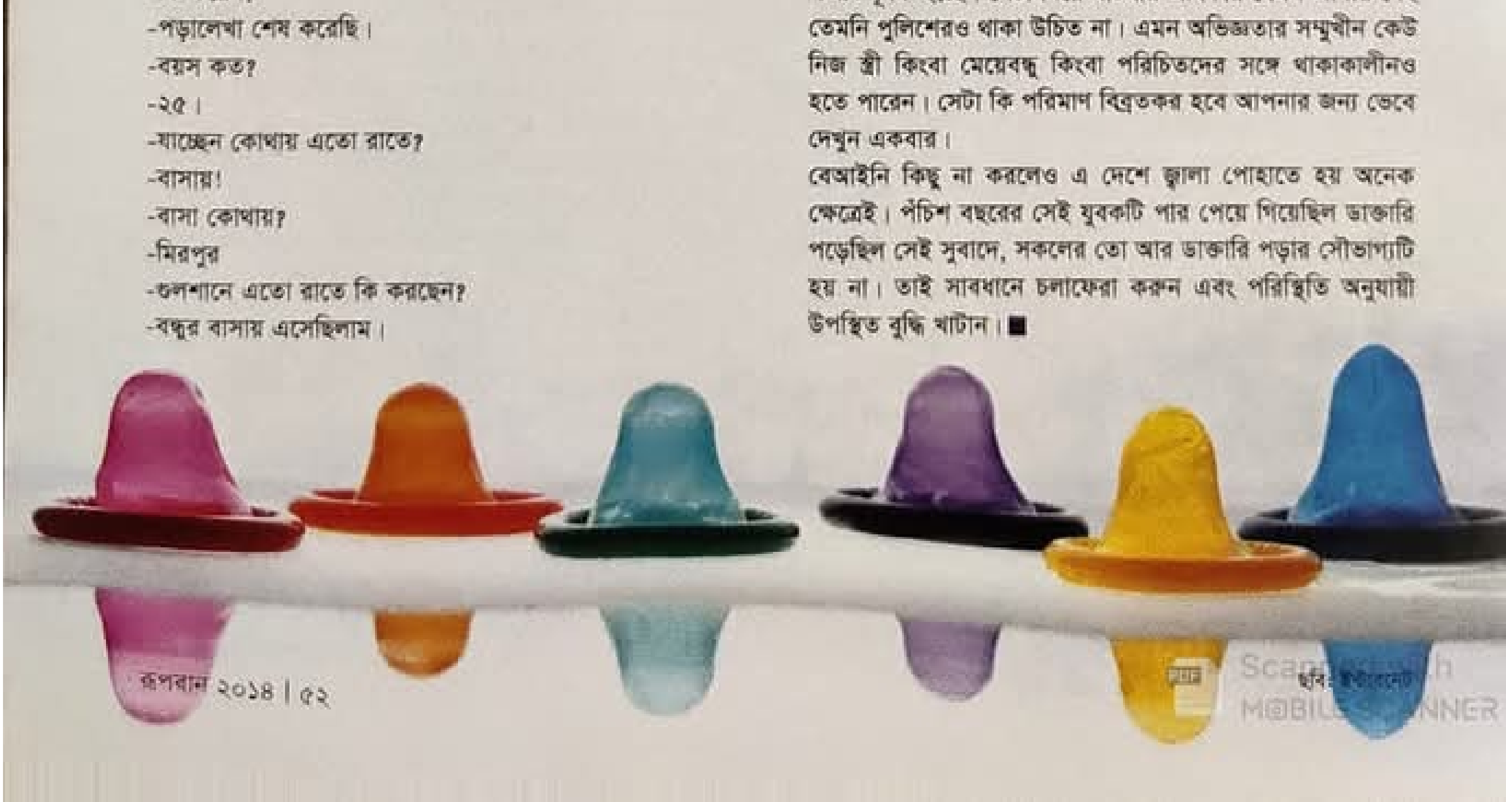

ছবিঃ ইন্টারনেট

Scanned with MOBILE SCANNER

প্রথম চুমু!

মালিবাগের চৌধুরিপাড়ায় আজ দুপুরে রিক্সাটার যখন চেইন পড়ে গেল, সেই খাঁ খাঁ রোদের হাত থেকে বাঁচতে একটু পশ্চিম দিকে হেলে বসতেই 'কন্সট্রাকশন সাইটে'র নির্মাণাধীন বহুতল বাড়িটার দিকে চোখ আটকে গেল। এটাই তো সেই জায়গাটা, বছর পনেরো আগে এখানে টিন শেডের একটা বড় পরিত্যক্ত ভাগাড় ছিল। স্মৃতির ট্রেনটা ঝড়ের বেগে হুড়মুড় করে কমলাপুরে ঢুকে গেল!

তিন ঘন্টা লেট! ও কি এখনো অপেক্ষা করে আছে? নাকি চলে গেছে? এতোক্ষণ অপেক্ষা করবার কথা না। চলে গেলেও বলার কিছু নেই ...ট্রেনটার উপর রাগ লাগছে, এতো লেট করলো কেন ? ও যদি চলে যায় তাহলে কি ওর বাসায় চলে যাবো? ঠিকানা তো মুখস্থ। খানিক পর ভিড় হালকা হলে এদিক-ওদিক খুঁজে হাল ছেড়ে দিলাম। ও তাহলে চলেই গেছে। মনটা একটু দমে গেলো। আসার পথে কত কিছু ভাবলাম। প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হওয়ার দরজার দিকে এগোতেই এক সৌম্যকান্তি যুবককে দেখলাম, আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। চিঠির বর্ণনা এই ছেলেটার সাথেই মিলে। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে দ্বিধাহীন একটা হাসি দিলো, আমাকে ঐ অতো মানুষের ভিড়ে কিভাবে চিনতে পেরেছিলো সেই প্রশ্নের জবাব আজও আমাকে তাড়ায়।

ওর নাম আশিক, আমার পত্রমিতা। প্রায় চার বছর ধরে চিঠি পাঠাই একজন আরেকজনকে। আশিক ঢাকায় থাকে। আমি একটা জেলা শহরে। চিঠিতে চিঠিতে হাজারো কথা হয়েছে দুজনের। বলছি সেই নব্বইয়ের শুরুর দিককার কথা, তখনো যোগাযোগ এতোটা সুলভ হতে শুরু করেনি। আশিকের চিঠির প্রতি আমার প্রচন্ড আগ্রহের একটাই কারণ, আমাদের দুজনের খুব মিল। ও যেন ঠিক আমার মতো, আমার পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা-ভাবনা কিভাবে কিভাবে যেন ওর সাথে ঠিক ঠিক মিলে যায়!

চিঠিতে চিঠিতেই আমরা আবিষ্কার করি আমাদের ভিন্নতা, আর সেই ভিন্নতাই যেন ওকে আমার আরও কাছে নিয়ে আসে। আশিক আমার থেকে বয়সে বড়, তার ওপর ও অনেক কিছু পড়ে। ওর কাছ থেকেই জানতে পারলাম আমরা দুজন ছাড়াও পৃথিবীতে এমন আরো অনেকে রয়েছে। ইতিহাস অন্তত তাই বলে!

আমার রাজধানী আগমন হেতু বিদেশযাত্রা। আমার চাচাকে চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উনার কোনো ছেলে না থাকায় ফাই-ফরমায়েশ খাটার লোক হিসেবে আমিও যাচ্ছি। পরদিন দুপুরে ফ্লাইট। প্রথম একা ঢাকায় আসা আর বিদেশযাত্রার উত্তেজনাকেও সেবার যেন ছাপিয়ে গিয়েছিল আশিকের সাথে দেখা হবার আনন্দে।

সেদিন দুপুরে একসাথে খেয়ে বেরোলাম। চিঠিতে কত শত কথা হয়েছে দুজনের মাঝে, কিন্তু সামনে এসে কেউ-ই কথা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি জড়তা কাটাতে পারছি না। আশিকও কোনো একটা প্রসঙ্গে কথা শুরু করে আমতা আমতা করে থেমে যাচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছে করছে আশিককে জড়িয়ে ধরতে। ওর কাঁধে মাথা রাখতে। চিঠিতে অনেক কিছু সহজে লেখা যায়, সামনা সামনি সেসব করা কি সম্ভব!

আকাশে ঘন মেঘ জমেছে, সন্ধ্যা হলো তাড়াতাড়ি। আমরা যখন ফেরার পথ ধরলাম, চৌধুরী পাড়ার কাছাকাছি এসে বৃষ্টি শুরু হলো ঝমঝম করে। পথঘাট মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেলো। আমি বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একটা চায়ের টঙের দোকানের ছাউনিতে দাঁড়ালাম। আশিক রাস্তা থেকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'চলো ভিজি।' আমিও সম্মোহিতের মতো নেমে আসলাম পথে। কাঁপতে কাঁপতে সেই প্রথম হাতে হাত রাখা। বৃষ্টিতে ভেজা নিয়ে আমার আগ্রহ কখনো ছিলো না, বাজ পড়ার ভয়ে বৃষ্টিতে ভিজি না সাধারণত। সেদিন সেই ভয়টা কোথায় উবে গেল!

অনেক্ষণ ভেজার পর আমি ঠান্ডা বরফ হয়ে গেলাম। আশে পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো জায়গাও নেই। কিছুদূর এগিয়ে চৌধুরী পাড়ার সেই পরিত্যক্ত ভাগাড়টা পেলাম। দরজা খোলা, দুজনে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে খুপচি খুপচি করে দুটো আলাদা রুম আছে, বসবার একটা কাঠের বেঞ্চি দেখলাম সেরকম একটা ঘরে। ভিতরে আমরা ছাড়া একটা জনমানব নেই, টিনের চালে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। আমরা একটা বেঞ্চে গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। আমি তখন শীতে রীতিমত কাঁপছি। আশিক আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ওর ভেজা শরীর থেকেও উষ্ণতার ছোঁয়া পেলাম। দুজনে খুব কাছাকাছি, একজনের নিঃশ্বাস এসে আরেকজনের গায়ে পড়ছে। আমার মনে হচ্ছে ঘোরের মধ্যে আছি।

আশিক আমাকে বেঞ্চটায় শুইয়ে দিলো, তারপর কাছে আসতে শুরু করলো। আমার নাকের কাছে ওর নাক, ওর চুল থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে আমার কপালে...আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আমার দুই ঠোঁট স্পর্শ পেল আশিকের দুই ঠোঁটের...হাত বাড়িয়ে ওর চুল খামচে ধরলাম। সময়টা যেন এখানেই থেমে থাকে। এই মুহূর্তটা যেন শেষ না হয়। দুজনের না বলা অনেক কথাই বলা হয়ে গেলো ঠোঁটের ছোঁয়ায়। মাঝখানে একটু বিরতি, এবার আশিকের মাথাটা টেনে নামিয়ে আনলাম আমার কাছে। দুজনের ঠোঁট প্রাণ ফিরে পেলো দ্বিতীয়বারের মতো।

কাঠফাটা রোদে কলিগের বাসায় জন্মদিনের দাওয়াতে যেতে ঢাকার এই পাশটায় আসা আমার সেই প্রথম চুমুর স্মৃতি মালিবাগের মধ্য দুপুরটাকে যেন আরো তাতিয়ে তুলল। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

আর ইউ ডিসক্রিট

নিজেকে প্রায়ই উৎকট একটা সঙ মনে হয়, মুখে আবীরের ঘনঘটা নেই, গায়ে কয়েক পরতের আলখেল্লা চড়িয়ে ডমরু বাজিয়ে বাজার না নাচিয়েও মাঝে মাঝে মনে হয় আমি একটা ক্লাউন! কোথাও কোনো এক অদৃশ্য মঞ্চে নিরন্তর পালা চলতে থাকে, আমি চেয়ে না চেয়ে সেই মঞ্চে আটকে পড়ে থাকি। বেল পড়লেই অভিনয় শুরু। মা, বাবা, ভাই, আত্মীয়, বন্ধু, পাড়াতো বড় ভাই, বাসার বাড়িওয়ালি থেকে শুরু করে বাসে পাশের সিটে বসা অচেনা লোকটি পর্যন্ত, সবার সাথে অভিনয়। প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে মুখে অদৃশ্য রঙ আর গায়ে অপমানের আলখেল্লা চাপিয়ে প্রিয়-অপ্রিয় মানুষগুলোর সাথে নিত্য অভিনয় চলছেই, সেই অভিনয়ের ধার এতোটাই তীক্ষ্ণ যে কোথাও কেউ মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করছে না, একবারের জন্যেও ভাবছে না যে আমি, এই ছাব্বিশ বছরের পূর্ণবয়স্ক যুবক যে কিনা সততার জন্য প্রায়ই তার বাবার গর্বের কারণ হয়, সেই আমি সজ্ঞানে তাদের সাথে দিনরাত একটি বিষয়ে নিখুঁত অভিনয় করে চলেছি। দিনশেষে ঘষে-মেজে সব কাপড় ছেড়ে নিরাভরণ নগ্ন আমি যখন বিছানায় শরীর রাখি, নিজের গা থেকে সঙের গন্ধ তখন ভক-ভক করে আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে থাকে।

মা সরকারী চাকুরে হওয়ায় ছোটবেলাটা নানুর কোলে কোলেই কেটেছে আমার, নানুর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে গন্ধ নিতাম আমি, কেমন যেন আঁঠালো একটা গন্ধ। সেই কোলে একটা লম্বা সময় জুড়ে জাল বেঁধেছে দৈত্য-দানো আর অসংখ্য রাজা-বাদশাহর গুচ্ছ গুচ্ছ কাল্পনিক কেচ্ছা। সেই সমস্ত গল্পের শেষে মন্দ মিথ্যাবাদীদের পরাজয় আমাকে প্রচন্ড নাড়া দিতো, ঠিক সেই কারণেই কিনা জানি না, কোনোকিছু চাপিয়ে ছাপিয়ে সত্যটাকে আড়াল করলে এখনো আমি নানুর গায়ের আঁঠালো গন্ধটা টের পাই। শুরুর দিকে প্রায়ই এই গন্ধ আমার নাকে এসে ঝড় তুলতো।

এখন আমি স্যামসাং-এর প্রায় কুড়ি ইঞ্চি একটা পর্দার সামনে বসে আছি। বিস্তীর্ণ সাদা স্ক্রিনের এক কোণায় কালচে কিছু গোটা গোটা শব্দ ফুটে রয়েছে- এইজ, সেক্স, লোকেশন? আমি কিছুক্ষণ বিরতি নেই, জিব বের করে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে ছাব্বিশ অক্ষরের কি-বোর্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, নিজের পছন্দমতো এইজ, হাইট, ওয়েট আর ওরিয়েন্টেশনের জাল বুনি, সত্যকে ধর্ষণ করি, কিন্তু আমার নাকে সেই আঁঠালো গন্ধের ঝাপটা এসে পড়ে না, আমাকে মিথ্যার গ্লানি আর স্পর্শ করে না। সঙদের আবার গ্লানি কিসের!

পয়লা বৈশাখের মাত্র দুদিন পর অফিসে 'লাঞ্চ আওয়ার' চলছে। এ কথা সে কথার হাত ছাড়াছাড়ি হতে হতে সেখানে চলে আসলো বছরের শুরুর দিন সমকামী র‍্যালির প্রসঙ্গ। আমি হঠাৎ করে চুপসে যাই, আমার ভিতরের অভিনেতা চমকে উঠে! ধরা পড়ে যাবো নাতো! খুব সাহস করে এই একটা দিনের জন্যই সত্যিকার অর্থে গায়ে রঙ চাপিয়ে একসাথে হাঁটতে গিয়েছিলাম। যাবো কি যাবো না করে দ্বিধান্বিত হতে হতে শেষমেশ র‍্যালিতে নিজেকে আবিষ্কার করি। সেই বিরল কয়েক মিনিটে জীবনে প্রথমবারের মতো নিজেকে সঙ মনে হচ্ছিল না! নিজের 'ডিসক্রিট আইডেন্টিটি'-কে দুমড়ে-মুচড়ে সেদিন প্রথম বুক উঁচিয়ে সবার সামনে হেঁটে গেলাম অথচ এখন আবার সেই অজানা ভয়ের সাথেই লড়াই। অফিসের কলিগরা সবাই জেনে গেলে চাকরি নিয়ে টান পড়তে পারে, সবার হেয় দৃষ্টিভঙ্গির মানসিক যন্ত্রণাতো আছেই, সেই সাথে ভয় আছে অফিস থেকে বন্ধু মহলে খবর চাউর হয়ে পড়ার। এসব হতে দেয়া যায় না, আমাকে আরও ভালো অভিনয় করতে হবে, যা চিরন্তন যা চলে আসছে এতোদিন, সেটাই সত্য এবং সঠিক। সেই 'লাঞ্চ আওয়ারে' আমিও ওদের সাথে সুরে সুর মেলাই, সমকামীদের জাতি-গোষ্ঠী উদ্ধার করতে থাকি। টেবিলে প্রায় ঠান্ডা চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার আগে মুহূর্তের জন্য কাপের তরলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোনো এক সঙের প্রতিচ্ছবি। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

তোমার প্রকাশ হোক!

আড়াল কাম্য, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয়। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্দুরে বৃক্ষের ছায়ার আড়াল দেখলে পথিকের লোভ জাগবেই। সে আড়ালের আশ্রয় নিলে ক্ষণিকের প্রশান্তিও আসবে দেহ মনে। সূর্যালোক ন্যায় সমাজের রুদ্র দৃষ্টি এড়াতে সমপ্রেমী পরিচয়কে আড়াল করে রাখাই শ্রেয়। সমাজের দূরের মানুষ কি কাছের মানুষ, সকলের সামনে একটা মুখোশ চড়িয়ে রাখাটাই যে নিয়ম।

আমি নির্ভীক নই। আড়ালের প্রশান্তিতে আমিও ভাগ নিচ্ছি। তবু কাছের মানুষজনের কাছে আপন স্বত্ত্বা লুকিয়ে চলবার সুখটুকু বড় মিথ্যে মনে হয়। কখনো-সখনো তাই মুখ ফুটে বলবার ইচ্ছেও জাগে। সম্পর্ক নষ্ট হবার ভয়টা সে ইচ্ছেকে দমিয়ে রাখে।

সেদিনও দমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ভাগ্য আমার প্রসন্ন। বিশেষ করে বন্ধুভাগ্য। সরণি আমার এককালের ছাত্রী। ছাত্রী-শিক্ষক হিসেবে সম্পর্ক শুরু হলেও সম্পর্কটা এখন গভীর বন্ধুত্বের পর্যায়ে। অন্য কাউকে বলতে পারে না এমন অনেক কিছু ও আমাকে বলতে দ্বিধা করে না সে। যেকোনো সমস্যায় পরামর্শ নিতেও কুণ্ঠা বোধ নেই। আমিও সবটাই বলবার চেষ্টা করি, কেবল সযতনে চেপে যাই জীবনের সমপ্রেমী অংশের কথাটুকু।

সত্য চেপে রাখা যায় না, অন্তত সরণির মতো বন্ধুদের কাছে। অনেক দিন পর দেখা। পুরো একটা দিন ব্যয় করেছিলাম তাই সরণির সঙ্গে। ধানমন্ডি লেকের আনাচ কানাচের গাছপালা গুলো আমাদের কিচিরমিচিরে নিশ্চয় অসহ্য হয়ে গিয়েছিল। আর সরণি অসহ্য হয়ে গিয়েছিল বার বার একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েই। দু-বছর আগেও বিয়ের প্রসঙ্গে বলেছিলাম করবো না, দুবছর পরেও কথা নড়নচড়ন হয়নি। তখনো বলেছিলাম কারণটা সঠিক সময়মতো সরণিকে বলবো, সেদিনও একই কথা বলে পার পেয়ে গেলাম।

সঠিক সময়টা কবে? দু-বছর আগে নয়, এখনো নয়, দু-বছর পরেও হবে না বোধকরি। আমাদের গল্পের ভাঁড় ফুরোয়নি সেদিন। সে ভাঁড় উজাড় করতে পরদিন পুনরায় আড্ডাবাজি। আর পরদিনই সঠিক সময়টা এসে গেল। সরণির জেদের জন্য নাকি আমারই ইচ্ছের জন্য সেটা মুখ্য ছিল না। একটা মানুষের কাছে কিছু লুকোতে হবে না, মুখোশ পরে ভাণ করতে হবে না, সে আবেগটাই মুখ্য হয়ে উঠলো আমার কাছে।

যদিও আবেগের আগে ছিল উদ্বেগ। কাছের বন্ধুটিকে হারাবার উদ্বেগ। সরণিকে বার বার সাবধান করছিলাম, ওর এই জেদ আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারে। আপন স্বত্ত্বাকে স্বীকার করে নিয়েছি আগেই, কিন্তু এই বন্ধুত্বের মূল্য আমার কাছে তার চাইতেও হয়তো বেশী ছিল। এবারে ভণিতা ছাড়াই মুখোশটা খুলে ফেললাম। প্রস্তুতি ছিল বন্ধু হারাবার তবু কেন জানি টের পেয়েছিলাম বন্ধু পাবার ক্ষেত্রে আমি সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছি।

বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া এলো না। যেমনটা আশা করেছিলাম তেমনটা হলো না, বরং যেমনটা হওয়া উচিত তেমনটাই হলো। সারাটা দিন একসাথে কাটালাম, একটি বারও ভিন্নভাবে তাকালো না সরণি, ভিন্নভাবে কথা বললো না। যেন বন্ধুত্বের তিল পরিমাণ বদলায় নি।

প্রকৃতই বদলায় নি। বদলাবার নয়। বৃক্ষের ছায়ার আড়াল ক্ষণিকের প্রশান্তি, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার প্রশান্তি তার চাইতে হাজার গুণ বেশি। সরণিই প্রথম নয় যার কাছে আমি তথাকথিত সাধু সমাজের দেখতে চাওয়া মুখোশটা খুলেছি। খুলেছি কাছের আরও দু-একজন বন্ধুর কাছে। ওদের কাছে এতোটা স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা পাইনি, তাই বলে আমাকে ছুঁড়েও ফেলেনি তারা। সময়ের সাথে বরং আরও বেশি গ্রহণ করতে জেনেছে ওরা। যাত্রাপথের সবটুকু ছায়া ঢাকা নয়। তাই বলে বৃক্ষের ছায়ার আড়ালে দিনযাপনের সুখই কতটা টেকসই? ■

ছবি: ইন্টারনেট

আমাদের চোখে সমপ্রেম

কামনার সম্পর্কের বাইরেও দুজন পুরুষ বা নারীর মাঝে যে আবেগী সম্পর্ক থাকে, 'রূপবান' সেটাকে তুলে ধরতে চায় বিভিন্নভাবে। রূপবান টিমের মাথায় আসে যে দুজন বিষমপ্রেমী দম্পতি কিভাবে দুজন সমপ্রেমী দম্পতিকে দেখেন। রূপবানের সাথে কথা বলতে রাজি হয়েছেন এমন এক বিবাহিত বিষমপ্রেমী যুগল, চলুন শুনি তারা কি বলে!

আপনার কাছে সম্পর্ক জিনিসটা কি? বৈবাহিক বা প্রেমের সম্পর্ককে আপনারা কিভাবে দেখেন?

পপলি: আমার কাছে সম্পর্ক হল দুজনের মধ্যে এমন এক বন্ধন যা বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা এবং পারস্পারিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে গড়ে উঠে। সেটা একটা ছেলে আর মেয়ে, ছেলে আর ছেলে, মেয়ে আর মেয়ে যাই হোক না কেন যদি ঐ তিনটি জিনিস থাকে তাহলে সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং তা টেকসই হবে। বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরেও আমাদের মধ্যে এই তিনটি জিনিস এখনও বিদ্যমান আছে বলে আমাদের সম্পর্ক টিকে আছে।

শার্দুল: এখানে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছো, সেটা হল শরীরী আকর্ষণ। শুনতে কানে একটু বাঁধলেও কথাটা ষোলো আনাই সত্য। আমি যদি তোমার প্রতি না আকর্ষণ অনুভব করি তাহলে তোমাকে নিয়ে সংসার করার কথা ভাবা কিংবা এক সাথে আমাদের থাকাও সম্ভব হতো না। এই একই জিনিস তোমার নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তুমি একজনের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করছো বলেই তার কাছে যাবে এবং একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চাইবে। তখন সময় সাপেক্ষে বিশ্বস্ততা তৈরি হবে, ভালোবাসা এবং পারস্পারিক বোঝাপড়া হবে এবং সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

আপনাদের সম্পর্ক হয়েছে কিভাবে?

পপলি: আমরা এক 'গ্রুপ' বন্ধু ছিলাম। কয়েকজন মিলে গ্রুপ, সবার সাথেই সবার বন্ধুত্ব ছিল। সেইভাবে শার্দুলের সাথে আমার বন্ধুত্ব। একটা পর্যায়ের পর আমার শার্দুলের জন্য বাকি বন্ধুদের চেয়ে আলাদা অনুভূতি কাজ করা শুরু করে। আমি সেটা অবলীলায় বলেও ফেলি তাকে। ওর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাইনি তখন। কিন্তু তাই বলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়নি। আমাদের গ্রুপের সব বন্ধুরাই জেনে গিয়েছিল যে, আমি শার্দুলকে পছন্দ করি এবং একই সাথে শার্দুল আমাকে নেতিবাচক সাড়া দিয়েছে। এটা মাস্টার্সের শেষ সময়কার কাহিনী। মাস্টার্স শেষ, আমরা সব ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ছিটকে পড়লাম। কারোর সাথে তেমন যোগাযোগ নেই। কিন্তু শার্দুলের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর যোগাযোগ শুরু হয়। তখন এমন মনে হয়নি যে অনেকদিন পর যোগাযোগ হচ্ছে, এইতো সেইদিন কথা হলো এমন লাগতো। ঢাকার বাইরে চাকরি করতো শার্দুল। মোবাইলে যোগাযোগ হতো, তেমন বেশি না। শার্দুল ফোন করতো, মনের কথা শেয়ার করতো। আমাদের মধ্যে অন্যরকম বোঝাপড়া হতে লাগলো। আমার মনে হয় মূলত ঐ সময়টায় শার্দুল আমার প্রতি দুর্বল হতে শুরু করে।

শার্দুল: বাকিটুকু আমিই বলি! আমি জানতাম, পপলি আমাকে পছন্দ করে। ব্যাপারটা তেমন গায়ে না লাগালেও ঘুরেফিরে ওর সাথে কথা বলতেই বেশি ভালো লাগতো, সময় কাটাতে ভালো লাগতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একবার আমি একদিনের জন্য ঢাকায় আসি এবং সারাদিন ঘুরে যখন আমি বাসে উঠছি তখন পপলির মানসিক অবস্থা আর আমার মানসিক অবস্থা প্রায় একই ছিল। আমাদের মানসিক নির্ভরতা আর আদানপ্রদানের জের ধরেই আমরা অনেক কাছাকাছি চলে আসি।

বিয়ের ব্যাপারটা আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

পপলি: আমার বিয়ে করবার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু যখন এমবিএ শেষ করি তখন আব্বা-আম্মা আমার বিয়ে না হওয়াতে আহাজারি শুরু করলেন। তাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেই। বিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে প্রথমত সম্পর্কের একটা ধরণই মনে হয়, এটা একটু 'আপগ্রেডেড', মানে দুজন এক সাথে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি পায় মাত্র। এটা বাদে বিয়েকে আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু হিসেবে ভাবতাম না, কিন্তু বিয়ে যখন করেছিই, এই বন্ধনকে সুন্দরভাবে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমি কখনও ভাবিনি শার্দুলকে আমি বিয়ে করবো। এক পর্যায়ে আমার বিয়ের জন্য আমি শার্দুলকে নিয়ে পাত্র দেখা শুরু করি! শার্দুলকে পছন্দ করি এর মানে এই না তাকে নিয়ে সংসার পাতার স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে থাকতাম। ওকে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসার 'ফ্যান্টাসি'ও আমার কাজ করেনি। আমাদের অন্যান্য বন্ধুদের তখন একে একে বিয়ে হচ্ছে। আর এই বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে দেখা হতে হতেই আমরা একে অন্যের আরো কাছে চলে আসি এবং এক পর্যায়ে 'বিয়ে তো করতেই হবে' দেখে দুজন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

সমাজ বা অন্যান্য সীমাবদ্ধতা বাদ দিয়ে বলছি, ধরুন আপনারা বিয়ে না করে এক সাথে থাকলেন, এতে কি আপনাদের সমস্যা হতো কোনো?

শার্দুল: বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী বিয়ের মাধ্যমে দুজন এক সাথে বসবাস করার বৈধতা পায়। যদি এই নিয়ম না থাকতো তাহলে হয়তো আমরা বিয়ে করতাম না। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে 'বিয়ে' সামাজিক রীতি হিসেবে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। আমরা বরাবরই 'প্র্যাক্টিক্যাল' ছিলাম। একজনের জন্য আরেকজন মরে যাবো বা বিয়ে না হলে বিষ খাবো, এমন কখনোই ছিল না। বিয়ে ছাড়া এক সাথে থাকা যদি বৈধতা পেতো তাহলে বিয়ে নাও করতে পারতাম আমরা।

সমপ্রেম সম্পর্কে জানলেন কিভাবে?

শার্দুল: কলেজে থাকতেই আবছা আবছা ধারণা পাই এই সম্পর্কে। বেশ আগের কথা তো! যদি তখনকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে বলা যায় 'গে' ব্যাপারটার সাথে কেউ পরিচিত ছিল না। এটা এক ধরণের 'আউট অব ডিকশনারি টপিক' ছিল সবার কাছে। কলেজে

Scanned with MOBILE SCANNER

থাকতে এরকম একটা ছেলে-ছেলে ব্যাপার জানার পর থেকেই আমার মনে হতো যে দুজন ছেলে এক সাথে কিছু করা মানেই হয়তো তাদের কিছু সমস্যা আছে। সঠিক শব্দ দিয়ে তাদেরকে সংজ্ঞায়িত করতে পারতাম না। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে উঠে আমার এই বিষয়ে জ্ঞান কিছুটা বাড়ে। তারপর ধীরে ধীরে এই ব্যাপারে আরও বেশি জানতে শুরু করলাম এবং সেই প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে।

পপলিঃ আমি আসলে তেমন কিছু জানতাম না! ইউনিভার্সিটিতে পড়বা সময় আমার সবচেয়ে কাছের এক বন্ধুর কাছ থেকে প্রথম ব্যাপারটা জানতে পারি। তখনও সমপ্রেমী শব্দটির সাথে পরিচিত হইনি আমি। আস্তে আস্তে আরো পড়াশুনা করতে লাগলাম ব্যাপারটা নিয়ে। বন্ধুর কাছ থেকে আরো জানতে শুরু করলাম, ইন্টারনেট থেকে জানলাম আরো অনেক কিছু। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগলেও যতো জেনেছি, ব্যাপারটা কুয়াশা কাটিয়ে স্বাভাবিক রূপে ধরা পড়তে থাকে আমার নজরে।

বিশ্ববিদ্যালয় থাকা অবস্থায় যখন জানতে পারলেন আপনার বন্ধুটি সমপ্রেমী, ব্যাপারটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে??

শার্দুলঃ তখনকার অবস্থা অনুযায়ী এই ব্যাপারে যেহেতু আমাদের জ্ঞান ছিলই না বলা চলে, তাও আমি সহজভাবেই নিতে পেরেছিলাম।

পপলিঃ আমার কাছে শুরুতে বেশ কঠিন ছিল। কথা বলতে বলতে বিষয়টি আরো ভালো করে অনুধাবন করি আমি। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির কল্যাণে এখন যেহেতু অনেকটাই জানা তাই এই ব্যাপার নিয়ে সেই অজ্ঞতাগুলো আর কাজ করে না।

আপনার বন্ধুটিকে কি আপনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন কেবলমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে নাকি যে-কোনো সমপ্রেমীকে আপনারা সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারবেন?

শার্দুলঃ সত্যি বলতে আমার কাছে সমপ্রেমী ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়নি। হতেই পারে, অস্বাভাবিকের কিছুই নেই। পরবর্তীতে যখন আরও বেশি এই বিষয়ে জানতে পারলাম তখন আরও বেশি এই ব্যাপারটাকে সমর্থন দিতে শুরু করলাম।

আপনারা এমন এক সমপ্রেমী দম্পতিকে চিনেন যারা দশ বছর ধরে এক সাথে আছে। তাদেরকে আপনারা কিভাবে দেখেন?

পপলিঃ তারা আমার খুব কাছের বন্ধু এবং তাদের সম্পর্ককে আমি অন্যান্য আট-দশটা দম্পতির মতোই দেখি। বলেই দিয়েছি আমার এই ব্যাপারে কোনো ছুঁৎমার্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তাদের সাথে পরিচয় হবার পর পরই জানতে পারি তারা সমপ্রেমী। যেহেতু আমার বন্ধুর কাছ থেকে আগেই ধারণা পেয়েছি এবং নিজেও জানি কিছুটা, তাই তাদের সম্পর্ককে গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা হয়নি। তারা দশ বছর ধরে এক সাথে আছে, এটা দেখতে খুব ভালো লাগে।

শার্দুলঃ সমপ্রেমী এই যুগলের সাথে আমার পরিচয় পপলির মাধ্যমেই। ওরা দুজন মানুষ হিসেবে অসম্ভব প্রাণোচ্ছল, ওদের বন্ধু হতে সময় লাগেনি। সময় লাগেনি ওদের সম্পর্ককে স্বাভাবিক চোখে দেখতেও।

সমপ্রেমের প্রতি সামাজিক অসমর্থন তো আছেই, সেই সাথে একটা পর্যায়ে আসে বিয়ের চাপ। এক্ষেত্রে তাদের কি করা উচিত?

পপলিঃ যেহেতু আমাদের সমাজ দুটো ছেলের প্রেম দেখে অভ্যস্ত নয়, সেহেতু তাদের সমাজের নিয়ম অনুসারেই একটা সময় বিয়ে করতে হবে, তাও একটা মেয়েকে। পরিবারের স্বার্থে অনেক সময় তারা এই পথে হাঁটতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারা যদি নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার না করতে পেরে পরিবারের কাছে মাথা নত করে একদিন বিয়েতে বসে যায়, সেক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে দুজনের জীবনই অনিশ্চয়তার মুখে পড়বার শঙ্কা থেকে যায়। এটা আসলেই বিশাল গোপন এক সমস্যা। মনে হচ্ছে, সমাজ গলা টিপে বসে আছে সমপ্রেমীদের।

শার্দুলঃ যদি পরিবারকে নিতান্তই না জানাতে পারে তবে আমার মতে তাদের সেই দেশে চলে যাওয়াই ভালো যেখানে সমপ্রেম বৈধ! আর নিজস্ব অবস্থান পরিষ্কার করতে পারলে তো চমৎকার! আমরা কেবল নিয়াজ আর সোমেলের সম্পর্ককে সমর্থনই করি না বরং কবে ওদের বিয়ের দাওয়াত পাবো সেই আশায় আছি।

আপনারা বলছেন তাদের বিয়ে করা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী এটি একটি অপরাধ। তাদের শাস্তি হতে পারে। তাহলে তারা কি করবে?

শার্দুলঃ একটা সময়ে কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক কিছুই অগ্রহণযোগ্য ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, দুজনকে পছন্দ করে বিয়ে করার ব্যাপারটা। আমরা পিছনের দিকে তাকালে বুঝতে পারবো যে, পছন্দ করে বিয়ে করাটাও পারিবারিকভাবে একটা সময় অপরাধের পর্যায়ে ফেলা হতো। পরিবর্তন তো এসেছে। আমরা যদি ভালো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি তাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সমপ্রেমী সম্পর্ককে বৈধতার আওতায় আনা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন সাহস এবং উদ্যোগ। এখন বলতে পারেন পালিয়ে বিয়ে করাও তো সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পায় না। অধিকার আসলে আদায় করে নিতে হয়। আমি এখনও শুনলাম না যে, একটা সমপ্রেমী পুরুষ দম্পতি পালিয়ে গিয়েছে, তারা বিয়ে করেছে! যেখানে সমাজে পুরুষের আধিপত্য বেশি এবং সেই দাপটেই তারা চলে সেহেতু এই ব্যাপারটা কি এক জোড়া পুরুষও ঘটাতে পারতো না? বরঞ্চ দেখলাম গ্রামের দুটো মেয়ে পালিয়ে গিয়ে তাদের প্রেমকে স্বীকৃত করবার চেষ্টা করেছে।

পপলিঃ আমিও একমত। ঘরের কোণায় লুকিয়ে থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় না। একতার খুব অভাব দেখি সমপ্রেমীদের মধ্যে। যখন সবাই একই কাতারে এগিয়ে আসবে, স্বার্থ থাকবে একটাই, নিজের ভালোবাসার অধিকার আদায় করা, একমাত্র তখনই কোনো পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে।

আপনারা সমপ্রেমীদের প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে পারবেন?

শার্দুলঃ অবশ্যই। শুরুটা করুক তারা, আমরা সাথে আছি! ■

নয় পেরিয়ে

আপনাদের মধ্যে 'সম্পর্কে'র শুরুটা কিভাবে হল?

নোবেলঃ শুরুটা কিছুটা নাটুকে ছিলো, কোনোদিন ভাবিনি এই ছেলের সাথে আমি সম্পর্কে জড়াবো। কক্সবাজারের একটা 'ট্রিপ' বলতে গেলে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

জয়ঃ আমি বলি পুরো ঘটনাটা। ২০০২ সালের কথা। ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারের যুগ তখন। সবার সাথে কথা বলার ওটাই দ্বিতীয় মাধ্যম, মোবাইলের পরে। ওখানে অনেক সমপ্রেমী বন্ধুদের সাথে নিয়মিত আড্ডা হতো আমার। তাদের মধ্যেই একজন আমাকে নোবেলের কথা বলল। ও নাকি খুব গম্ভীর, কাউকে বেশি পাত্তা দেয় না। আমাকে পুরো ব্যাপারটা খুব আগ্রহী করে তোলে, কে এই নোবেল যে কিনা রূপের দাপটে বাঁচে না!

নোবেলঃ আমি কিন্তু মোটেও দাপট দেখাইনি কখনো। সব বানানো সবার। একটু গাম্ভীর্য নিয়ে থাকলে...

জয়ঃ আমায় শেষ করতো দাও! সেবার আমরা কিছু বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম কক্সবাজার বেড়াতে যাবো। আমি খুব চাইছিলাম নোবেল যেন অবশ্যই আমাদের সাথে যায়।

নোবেলও কি ভেবে যেন রাজি হয়ে গেল, ঐ বাসেই আমাদের প্রথম দেখা। সেই একসাথে বাসে বসে যেতে যেতে সোয়া চার শ কিলোমিটারের রাস্তায় কেমন যেন একজন আরেকজনের কাছে চলে এলাম। কক্সবাজার পৌঁছে সেই কাছে আসাটা যেন আরো দৃঢ় হতে লাগলো। নোবেল একদিন পরে ঢাকা চলে আসলো আর আমি গেলাম চট্টগ্রাম, তবে একজন আরেকজনের ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম সেই তখন থেকেই।

ভালোবাসার প্রস্তাবও কি তখনই আসে?

জয়ঃ খুব দ্রুত! ব্যাপারটা বেশ মজার! আব্বার সাথে আমি ঝগড়া করছিলাম বাসায়, এমন সময় নোবেলের ফোন, রাগটা তখনো মাথায় ছিল। নোবেল বলল কি জানি দরকারি কথা বলবে, আমি ঝোঁকের সাথে বলতে বললাম। এমন কিছু বলবে আশা করিনি!

তাহলে প্রেমের প্রস্তাবটা কি ঝোঁকের বশে ছিল?

নোবেলঃ না, আমি মনে করি না। আমি ওকে ঝোঁকের বশেও প্রস্তাব দেইনি আবার খুব ভেবেচিন্তে দিয়েছি তাও না। আমার মনের মধ্যে এই কথাটা ভারের মতো কেমন জমতে শুরু করেছিল। না বললে হয়তো আরও খারাপ লাগতো। আর আমার এরকম অভ্যাস আছে, যখন যা মনে চলছে বলে দিতে চাই।

নোবেল ভাইয়ের মতো আপনার ক্ষেত্রেও কি একইরকম টান কাজ করেছে ভিতরে?

জয়ঃ না! একদম না! শুরুর দিকে ওর প্রতি আমার সেরকম উথাল-পাথাল টান কাজ করতো না। আমার ধারণা ছিল আমি কেবল ভালো কিছু সময় কাটাচ্ছি ওর সাথে। কিন্তু মাসের পর মাস যতো যাচ্ছিল, আমি আসলে একটু একটু করে ওর উপর নির্ভর হয়ে পড়ছিলাম নিজের অজান্তেই। সেই সময় একটা মেয়ের সাথেও আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে যেটা আমি নোবেলের কাছে লুকিয়েছিলাম আসলে। পরে একটা পর্যায়ে আমাদের দুইজনেরই এক কাছের বন্ধুর চক্রান্তে পুরো ব্যাপারটা নোবেলের কানে গিয়ে পৌঁছায়। নোবেল আমার বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে আমাকে বলেছিল যে সে এভাবে লুকোচুরির সম্পর্ক চায় না। ঐদিন প্রথম টের পেয়েছিলাম যে ওর উপর আমি কতটা নির্ভর করে ফেলেছি। ও আমার কাছে থেকে চলে যাবে ভাবতেই আমার চিন্তা-চেতনা একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়।

নোবেলঃ সেই ভয়াবহ দিনের কথা আর কি বলবো! জয় যা করলো! ছাদ থেকে সোজা বাথরুমে ঢুকে হারপিক খেয়ে বিচ্ছিরি এক কাণ্ড! আমি তো দরজা ভেঙ্গে বের করে আনলাম ওকে, ভয়ে কাঁপছিলাম আমি। ভাগ্যিস ঐদিন বাসায় আর কেউ ছিলো না।

জয়ঃ ওটা করা ঠিক হয়নি একদম, কিন্তু তুমি চলে যাবে ভাবতেই আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে একদম উচিত হয়নি, বয়স কম বলে করেছিলাম এমনটা।

এরপর সম্পর্ক কিভাবে আগাতে লাগলো?

জয়ঃ যতোই দিন যেতে লাগলো সম্পর্ক আরও বেশি মজবুত হতে লাগলো। আমরা দুজন দুজনের পরিবারের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যে বোঝার কোনো উপায় রইলো না আমরা পরিবারের বাইরের কেউ। একজন আরেকজনের বাসায় যাওয়া-আসা, পারিবারিক বিষয়গুলো ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়া, সবকিছু দুজন একসাথে পরিকল্পনা করা এসব তো হরহামেশাই হয়েছে।

নোবেলঃ আসলে এই ব্যাপারটাই আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করে। জয়ের সাথে কথা হতো দিনরাত, দেখাও হতো প্রত্যেকদিন। আজ অবধি আমরা প্রত্যেকদিন দেখা করি। এক রাতে ফোনে কথা হচ্ছে, জয় হঠাৎ করে বলল বাসায় চলে আসো, তখন কিন্তু রাত আড়াইটা। আমার মাথাতেও জানি কি হয়ে গেল, আমি ঐ রাতে কাউকে না জানিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। ওর বাসার সামনে গিয়ে দেখি মেইন গেট বন্ধ, দেয়াল টপকিয়ে ঐপারে নামলাম। আসলে ঐ সময়টায় কম বয়সে ঝোঁকের মাথায় কত কি যে করেছি! একসাথে খেতে, ঘুরতে কিংবা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওকে চুমু দেয়া, কত পাগলামি।

আপনাদের সম্পর্কটাতো অনেক দিনের, ঝামেলা হয়নি কখনো?

Scanned with MOBILE SCANNER

জয়ঃ অনেকদিন মানে নয় বছর, যদিও মনে হয় এইতো সেদিনের কথা! একটা কথা আমি সবসময় বলি, প্রেমিকের চাইতে বন্ধু হিসেবে হয়তো আমরা আরো অনেক কাছের। আমরা যদি একোনদিনে প্রেমিক হয়েওনাও থাকতাম, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে বন্ধু হয়ে আমরা ঠিকে থাকতাম খুব ভালোভাবেই। থাকবোও। এটা অবশ্য ঠিক যে দীর্ঘ সময় জুড়ে একটা সম্পর্ক চলতে থাকলে তা হয়তো একসময় আগের মতো রোমাঞ্চকর থাকে না, কিছুটা থিতু হয়ে আসে। কিন্তু ঝগড়া করেও এই এতো বছরেও ওর সাথে কয়েক ঘন্টার বেশি কথা না বলে থাকিনি। আমিই আসলে অস্থির হয়ে যেতাম। এখনো যাই।

নোবেলঃ আমার কাছে মনে হয়, জয় আমার বাচ্চার মতোন। ওর সব সিদ্ধান্ত, সব বোঝা-পড়ায় আমার থাকা দরকার। ও রাগ করে থাকলেও আমি ওর বড়, তাই আমি অনেক সময় এগিয়ে যাই মান ভাঙাতে। আর আমি যেখানেই যাই না কেন ওকে সবসময় কাছে রাখার চেষ্টা করেছি। নিজে কিছু একটা করতে গেলেই ওর কথা মনে পড়ে। একটা রেস্টুরেন্ট দেখলাম, একা একা খাবো? নাহ! ওকে ছাড়া কি করে খাই!

কি সেই রহস্য যা আপনাদেরকে নয়টা বছর একসাথে এরকম জোড়া সম্পর্কে রেখেছে?

জয়ঃ আমরা দুজন দুজনের উপর খুব নির্ভরশীল। আমি যেমন একটা সিদ্ধান্ত ওকে না জানিয়ে নেই না, ঠিক তেমনি নোবেল সবসময় সব ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলে নেয়। আমরা দুজন দুজনের উপর এতোই নির্ভরশীল যে দূরত্বের ব্যাপারটা মাথাতেই আসেনি।

পরিবারের মধ্যে আপনাদের সম্পর্ক নিয়ে কি কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে?

জয়ঃ আমরা তো একজন আরেকজনের পরিবারে মিশে আছি। সেই হিসেবে ওর মা প্রায় সময় বলত, তোমাদের মধ্যে কিছু আছে কি না। আমার মা একদিন একই কথা জিজ্ঞেস করেছে। আমাকে আমার মতো করে সামাল দিতে হয়েছে।

নোবেলঃ সমস্যা খুব বেশি হয়নি। আমার মা তো ওকে খুব পছন্দ করে। কিছুদিন আগে প্রায় ছয় মাস ও তো আমার বাসাতেই ছিল।

কখনও একসাথে থাকার কোনো পরিকল্পনা করেননি?

নোবেলঃ হ্যাঁ করেছিলাম। আমরা দুজন বাইরে চলে যেতে চেয়েছিলাম। অবশ্য বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার জন্য শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি।

জয়ঃ নোবেল ওর পরিবারের একমাত্র ছেলে। সে বিয়ে করবে, সংসার করবে এমন আশা পরিবারের থাকবে স্বাভাবিক। তাই অনেকরকম জটিলতা এড়াতেই একসাথে থাকাটা বাস্তবে আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমরা যেভাবে একজন আরেকজনকে সঙ্গ দেই, একসাথে থাকার মতোই সেটা।

দুজনের একজন আরেকজনের পছন্দ ও অপছন্দের দিকগুলো কি কি?

জয়ঃ অপছন্দের দিকটা আসলে অনেক বেশি বড়। তাও ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। পছন্দের দিক হল সে অনেক খেয়াল রাখে আমার, অ্যাটেনশন দেয় এবং আমাকে বোঝে। আর সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি ওর শামুক স্বভাব। কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু ওর কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই। বেশিরভাগ ঘটনাই নিজের মধ্যে চেপে রাখে। আমি আবার মানসিক চাপ নিতেই পারি না, ঘটনা যেখানেই ঘটলো সেইখানেই সেটা মিটমাট করে ফেলি।

নোবেলঃ মজার ব্যাপার হল, আমরা কিন্তু একে অন্যের স্বপ্ন-পুরুষ বা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি না। জয়ের যে ধরণের ছেলেদের পছন্দ, লম্বা-ফর্সা, তার ধারে কাছে দিয়েও আমি যাই না আবার আমার যে রকমের ছেলে পছন্দ, ও সেরকম না। তবুও কিন্তু আমরা পাগলের মত একে অন্যকে ভালোবাসি। ওর সবচেয়ে যে স্বভাবটা আমার পছন্দের সেটা হচ্ছে সে আমাকে ভালোবাসে। আমাকে সব কিছুই বলে, কিছু লুকায় না। আমাকে বিশ্বাস করে। আর অপছন্দের স্বভাব হল, ওর খামখেয়ালিপনা। ভবিষ্যৎ নিয়ে একদম ভাবে না। আমি সব সময় রুটিন মাফিক কাজ করতে পছন্দ করি আর সে হল উলটো!

'বহুগামিতা'কে আপনারা কিভাবে দেখেন?

জয়ঃ যেহেতু আমরা দুজন দুজনের কাছে একদম খোলামেলা, সবকিছুই 'শেয়ার' করি তাই এই ব্যাপারে আমাদের মাঝে জড়তা নেই। অনেকে বলে আমরা সমপ্রেমিরা নাকি বহুগামি। বহুগামিতা কিন্তু সবক্ষেত্রেই রয়েছে। তবে সত্য বলাটা খুব দরকারী। খুব ছোট্ট একটা মিথ্যাও অনেক বড় ক্ষত তৈরি করতে পারে। নোবেল যাই করুক না কেন, দিনশেষে আমি জানি ও আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছে না। আমার কাছে এই সত্য জানাটা সবচেয়ে দরকারী।

নোবেলঃ একই ধারণা আমারও। সে কি করছে না করছে, সবই জানছি। এতে করে মাঝে মাঝে মন খারাপের মত ঘটনাও যে ঘটে না, তা কিন্তু না। কিন্তু একদিনের একটা সামান্য ঘটনায় তো নয় বছর মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। আর আমার সাথে সম্পর্ক বলে অন্য কারোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না, এমন ছেলেমানুষীর পর্যায় অনেক আগেই পার করেছি। এখন তো আমরা একজন আরেকজনকে উলটো খোঁচা মারি এসব ব্যাপারে।

নতুন যারা সম্পর্কে জড়াচ্ছে, তাদের জন্য কি বলবেন?

জয়ঃ তাদেরকে আমি একটা কথাই বলবো, সম্পর্ক তিনটি ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। তা হল বিশ্বাস, বোঝাপড়া আর স্বচ্ছতা। এই তিন ভিত্তির উপর সম্পর্কের মজবুত গাঁথুনি থাকলে কেউ তা নাড়াতে পারবে না।

নোবেলঃ সম্পর্ক বলে কয়ে তো আসলে হয় না, এটা হয়ে যায়। তাই সম্পর্ক করবো, হচ্ছে না কেন ইত্যাদি হা-হুতাশ কেবলমাত্র ছেলেমানুষী বাহুল্য। সম্পর্ক খেলনাও নয় যে কিছুদিন খেললে মজা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও এটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত।

আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

জয়ঃ যা আছে ভাগ্যে তাই হবে। আমি পরিকল্পনায় বিশ্বাসী না। নোবেল আমার সাথে সারাজীবন থাকবে এতটুকু আশা করি সবসময়ই।

নোবেলঃ যদি ও পাশে থাকে, আমার জীবন কেটে যাবে। আমারও কেবল এই এতটুকুই চাওয়া... ■

Scanned with MOBILE SCANNER

জাগরীতে একদিন

দিনটা আর দশটা দিনের মতো শুরু হলেও সাত সকালে একটা কাজে আমি আর আমার এক বন্ধু গুলশানে যাই। ফেরার পথে সেই বন্ধুর প্রলোচনায় আমি ঢাকার আইসিডিডিআর,বি'র জাগরীতে এইচআইভি পরীক্ষা করাতে যাই।

শুরুতে বলে রাখা ভালো আমার কিন্তু এই টেস্টের ব্যাপারে কোনো রূপ ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না এবং আমার জাগরীতে যাবারও কোনো উদ্দেশ্য শুরু থেকেই ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধুর মতামত অনুযায়ী কোনো অসুখই বলে কয়ে আসে না এবং যৌন-সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয় আমাদের অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এই বিষয়ে সামান্য উদাসীনতাও আমাদেরকে অনেক কঠিন সময়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এইচআইভি এইডস্ এই ব্যাধিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক একটি রোগ। কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বাস্তবতায় আপনি কখনোই নিজেকে শতভাগ এই রোগের আওতামুক্ত ঘোষণা দিয়ে বসে থাকতে পারেন না। এইচআইভি টেস্ট করানোর মাধ্যমেই আপনি একমাত্র নিজেকে সুরক্ষিত প্রমাণ করতে পারেন। এই পরীক্ষা আপনার জীবনের অন্য আর দশটা সাধারণ মেডিকেল টেস্টের মতোই স্বাভাবিক একটা ঘটনা।

যাই হোক, সেদিন সকালে মাথায় এসব আসেনি। এত কিছু রেখে এইচআইভি পরীক্ষা কেন? আমার কি এইচআইভি হবার কোনো কারণ আছে? মাথায় তখন এমন হাজারটা প্রশ্ন। আর এই সব নানা চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতেই একটা সময় নিজেকে জাগরীতে আবিষ্কার করলাম।

লবিতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভিতর থেকে আমার ডাক পড়ে। মনের মধ্যে কিছুটা সংশয় আর চাপা ভয় নিয়ে আমি ভিতরে গিয়ে বসলাম। রুমটা খুব বড় না হলেও রুমের মধ্যে প্রচুর বই দেখলাম যার বেশির ভাগই এইচআইভি সম্পর্কিত। যথারীতি ডাক্তার সাহেব আমার সাথে কথাবার্তা শুরু করলেন। আমার পরিচয় এবং জাগরীতে আসার কারণ জানার পর তিনি নিজের পরিচয়ই দিলেন, তিনি একজন মনোবিজ্ঞানী সেটাও জানালেন।

আলাপচারিতার শুরুতে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন আমাদের মধ্যকার সকল কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে গোপন থাকবে। কিন্তু তারপরও নিজের সম্পর্কে অচেনা একজন মানুষের সাথে কথা বলতে আমার কেন যেন সংকোচবোধ হচ্ছিল। প্রথমে তিনি এইচআইভি সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

- আপনি কি জানেন এইচআইভি কি?
- এটি কীভাবে মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটায় জানেন?
- কিভাবে প্রতিরোধ সম্ভব বলুন তো?

ইন্টারনেটের এই যুগে এই সকল প্রশ্ন আমার কাছে তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্ন ছাড়া কিছুই মনে হল না। তারপরও আমি ও আমার জানা তথ্যগুলো আবার একবার মিলিয়ে নিলাম।

প্রশ্ন উত্তর পর্বের শুরুতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আমার মনে হল আমার এইচআইভি পরীক্ষা করা প্রয়োজন?' আমি তাকে বললাম, 'এই যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অবাধ মেলামেশা তাতে তো যে-কোনো দিন যে-কোনো কিছু হয়ে যেতে পারে। সেই রকমই কিছু একটা আমি করে ফেলেছি, তাই পরীক্ষাটা করা দরকার।'

তিনি আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সেই সঙ্গীটিকে আপনি বিশ্বাস করতেন?' আমি উত্তরে বললাম, 'কেন করব না, না করলে তো ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না।' সে আবার আমাকে বলে, 'তাহলে এখন কেন টেস্ট করাতে চান?' আমি কোনো উপায় না দেখে তাকে বলি, 'সেই বিশ্বাসের ডাক্তারি স্বীকৃতির জন্য!' আমার দিকে ডাক্তার এবার কিছুটা মুচকি হেসে তাকালেন।

তাঁর এই ধরনের প্রশ্ন শুনে আমার মনে হচ্ছিল এবার হয়তো আমাকে আরো কঠিন অবস্থায় ফেলবেন উনি। হলও তাই, উনার পরবর্তী প্রশ্নের জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি শারীরিক মিলনে সম্পর্কে আরো বিস্তারিত কিছু প্রশ্ন সামনে রাখলেন। হঠাৎ করে সংকোচ ব্যাপারটা কেমন যেন উবে গেল

এই জবাবে মোটেই অবাক হলেন না। বুঝতে পারলাম আমার মতো টেস্ট করাতে আসা লোকের সাথে উনি আগে থেকেই পরিচিত। এবার আমার স্বস্তির মাত্রা যেন আকাশ ছুঁলো।

তারপর তিনি আমাকে সুরক্ষিত এবং অসুরক্ষিত যৌনসম্পর্কের নানান দিকগুলো নিয়ে আলাপ করলেন, যৌনসম্পর্ক এবং যৌনসঙ্গী, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কিছু কথা বললেন। শুরুতে নিজেকে গোয়ালঘরে বাঁধা বাছুর মনে হলেও পরে তাঁর কথার গুরুত্ব আমি বুঝতে পারি।

শারীরিক বিষয় নিয়ে কথা শেষ হবার পর তিনি আমার মানসিক বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলা শুরু করেন। তার কথার শুরুটাই এমন ছিল যে জীবন কোনো কারণে থেমে থাকতে পারে না।

আমার কোনো মেয়েদের প্রতি শারীরিক আকর্ষণ আছে কিনা জানতে চাইলেন। এরপর খুব গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন, 'যদি আপনার এইচআইভি পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয় তাহলে আপনি কি করবেন?' হঠাৎ করে এমন একটা প্রশ্ন শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেলাম। কিছুটা শান্ত গলায় বললাম, 'জানি না কি করব, সেভাবে কিছু চিন্তা করি নাই, আপনারা যেভাবে চলতে বলবেন ঐভাবে চলব।' তিনি আমাকে বললেন, 'ধরুন আপনার এইচআইভি রিপোর্ট খারাপ আসল, তখন কার কাছে যাবেন? কেউ আছে এমন?' তার কথা শোনার পর কিছুটা হাসলাম কারণ কেন জানি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল, ডাক্তার সাহেব আমার হাসির কারণ জানতে চাইল আমি তাকে বললাম, 'জীবনে হয়ত এই একটা জিনিস নিয়েই গর্ব করতে পারি কারণ আসলেই আমার কিছু বন্ধু আছে যারা কখনোই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না।' ডাক্তার সাহেব নিজেও বললেন, 'এমন বন্ধু পাওয়া আসলেই কঠিন।'

এরপর তিনি আমাকে পাশের রুমে যেতে বললেন, সেখানে তার সহকর্মী বসে ছিলেন। তিনি আমার রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করলেন এবং আমাকে পরের দিন আসতে বললেন।

পরের দিন যথারীতি আমি জাগরীতে চলে গেলাম, মনটা অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত ছিল। এর আগে জীবনে এই টেস্ট করায়নি। অনেক কিছু মাথায় ঘুরছে। একটা সময় মনে হচ্ছিল উত্তেজনায় মাথাটাই হয়ত ফেটে যাবে। সময়মতো ভিতরে ঢুকলাম, ডাক্তার সাহেবের হাতে একটা রিপোর্ট ছিল। ঐটা দেখে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। তারপরও আমি তার সামনে গিয়ে বসলাম। সে গতদিনের মতো আমার সাথে কথা শুরু করল, সে বলল, 'এই রিপোর্ট যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তো কোনো কথাই নাই কিন্তু আমি আপনাকে বলব, প্রতি ছয় মাস পরপর পরীক্ষা করা ভালো, আর যদি রিপোর্ট পজিটিভ হয় তাহলে কি কোনো প্ল্যান আছে? কি করবেন বলতে পারেন?' আমি তার কথার উত্তরে বললাম 'আপনি তো আগেও বলেছেন জীবন কোনো কিছুর জন্য থেমে থাকে না, তাহলে আমি কেন নিজের জীবন নিজে নিতে যাব? আর অসুরক্ষিত কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' আমার এই উত্তরে তিনি রীতিমতো অট্টহাসি দিয়ে বললেন, 'আসলেই, জীবন থেমে থাকে না।' উনার কাছ থেকে সেই রিপোর্ট হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বাসার দিকে রওনা দিলাম।

আমার রিপোর্টে কি ফলাফল এসেছিল খুব জানতে ইচ্ছা করছে? তাতে আপনার কি আসে যায়! আমার রিপোর্টের ফলাফল আপনার জীবনে তো কোনো পরিবর্তন আনবে না। বরং নিজের সম্পর্কে সচেতন হউন, অনিরাপদ সম্পর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আর ডাক্তারের সেই কথাটাই আরেকবার বলছি, ছয় মাস পরপর এইআইভি পরীক্ষা করান। ■

ছবি: ইন্টারনেট

জাগরী

'জাগরী' ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-এর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যার-া এইচআইভি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং স্বল্প মূল্যে এইচআইভি পরীক্ষা করে থাকেন।

'আসুন এইচআইভি পরীক্ষা করি, চিন্তা মুক্ত আগামী গড়ি' এই স্লোগান নিয়ে ২০০২ সালের জানুয়ারিতে জাগরী তাদের যাত্রা শুরু করে, শুরুতে এর উদ্দেশ্য ছিল গোপনীয়তার সাথে এইচআইভি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সঠিক মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এইচআইভি পরীক্ষা করা। বিগত বছরগুলোতে জাগরী তাদের পরিসেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি ঢাকার বাইরে তিনটি বড় শহরে তারা সেবা দিয়ে আসছে। তাছাড়া ২০০৭ সাল থেকে তারা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে একত্রে কাজ করছে এবং বর্তমানে পঞ্চাশটিরও বেশি এইচআইভি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

জাগরী সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো (শুক্রবার ও শনিবার) ব্যতীত সপ্তাহের প্রত্যেকদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তাদের পরিসেবা দিয়ে থাকে। এইচআইভি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এবং এইচআইভি পরীক্ষার জন্য জনপ্রতি ৫০ টাকা ফি প্রযোজ্য।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
আইসিডিডিআর,বি, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
(মেইন গেট দিয়ে ঢুকে অগ্রণী ব্যাংকের ২য় তলায়)
ফোনঃ ৮৮৬০৫২৩-৩২ এক্সঃ ২৪৩৬;
ই-মেইলঃ jagori@icddrb.org
পরামর্শদাতাঃ
মাহফুজা রহমান শিখা- ০১৭১৩-৩৮৪৪৭৭
মোঃ মিজানুর রহমান খান- ০১৬৭১-৯৬৪১৯৭
মোঃ মাহফুজুল হক- ০১৭১৬-২৮০৮৮৮

বাইরে প্রচণ্ড গরম, তাপমাত্রা কখনো চল্লিশ ডিগ্রী সেলসিয়াসও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় আপনার গায়ে যে পোশাকটি জড়িয়ে বাইরে বেরুচ্ছেন, তার ব্যাকরণ কেমনতর হওয়া উচিত, সেটি জানা খুব জরুরি। আপনার গায়ে জড়ানো জামাটি কি কাপড়ের তৈরি, সেটা একবার দেখে নিয়েছেন তো? যতটা সম্ভব সুতি এবং পাতলা কাপড়ের তৈরি শার্ট পরবার চেষ্টা করুন। পোশাকে যেকোনো রকম ভারিক্কি আপনার কর্মব্যস্ত দিনটিকে দুঃসহ করে তুলতে পারে।

চোখের সহনশীলতা গরমের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। দেখলেই গরম লেগে যায় এমন রঙ পরিহার করে হাত প্রসস্ত করুন নরমের দিকে। গরমের ঐতিহ্যবাহী নরম রঙটা যদিও সাদাই, তবে সাদাতে যাদের মানায় না বা পরতে চান না তারা হালকা নীল, জলপাই সবুজ, শ্যাওলা সবুজ, হালকা গোলাপী, হালকা হলুদ, ঘিয়ে এসব রঙের হালকা শেডের দিকে ঝোঁকা উচিত।

এসব রঙ যেমন আপনার শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করবে, তেমনি অন্যের চোখের জন্যে হয়ে উঠবে স্বস্তিদায়ক। শার্টের ক্ষেত্রে ফ্লোরাল ডিজাইন ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে, আপনার চেহারার সাথে সেটা মানানসই কিনা দেখে নিন। প্যান্টের ক্ষেত্রে সুতি বা লিনেন কাপড়ের দিকে খোঁজ করুন। অফিসিয়াল ব্যস্ততা বাদ দিয়ে সন্ধ্যায় বাইরে বেরোতে এই গরমে শর্টস হতে পারে একই সাথে আরামদায়ক এবং ট্রেন্ডি। তবে

Scanned with MOBILE SCANNER

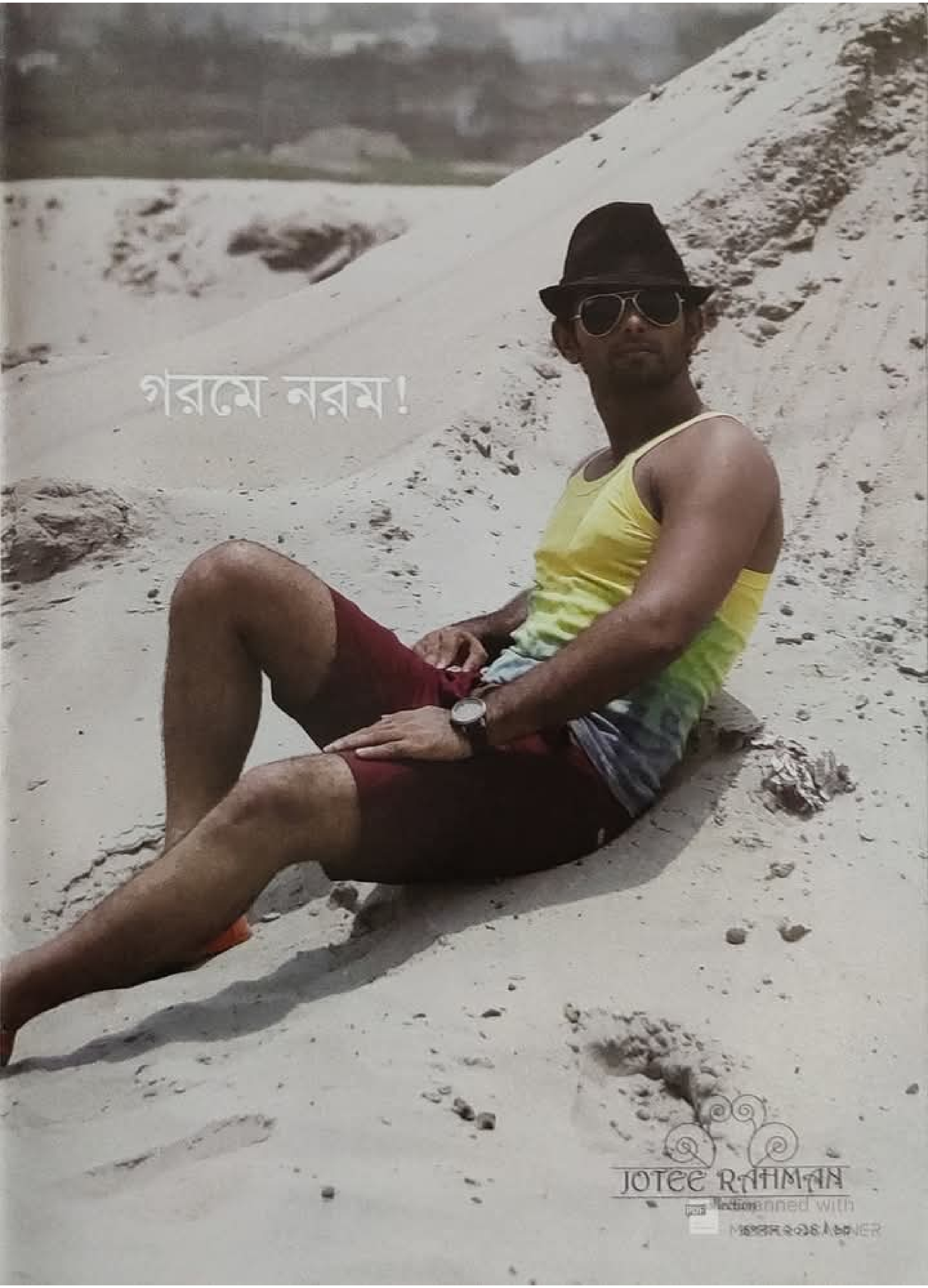
গরমে নরম!
JOTEE RAHMAN

Scanned with MOBILE SCANNER

টাওয়েলের সুস্বাস্থ্য!

গোসলের পরে নিত্য অনুষঙ্গ হিসেবে আমাদের শরীরের সবচেয়ে কাছাকাছি যে বস্তুটি আসতে পারে, তার নাম বাথ টাওয়েল। টাওয়েল নামক বস্তুটির সাথে কমবেশি আমরা সবাই পরিচিত, প্রয়োজনের ধরন অনুযায়ী সেটা গোসল/বাথ টাওয়েল, কিচ টাওয়েল, পায়ের/ফুট টাওয়েল, পেপার কিংবা ডিস্পোজেবল টাওয়েল হতে পারে। তবে বাংলাদেশী বাস্তবতায় আমাদের সবচেয়ে ব্যবহৃত টাওয়েলটি হচ্ছে গোসলের টাওয়েল। প্রতিদিন গোসল থেকে বের হয়ে এসে কিংবা মুখ ধোয়ার পর আমরা এই বস্তুটির শরণাপন্ন হই। আমাদের দৈনন্দিন কর্ম ব্যস্ততায় আমাদের শরীরের যত্ন নিতে কমবেশি সচেতনতা থাকলেও সবসময় যেই কাজটি ভুলে যাই তা হল পরিচ্ছন্নতার সাথে জড়িত অনুষঙ্গিক বস্তুগুলোর সঠিক ব্যবহার। আমাদের একটু অসাবধানতার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হতে পারি নিত্য নতুন ভাইরাসের কবলে। একটা বড় সময় গোসলখানায় থাকার কারণে গোসলের টাওয়েলে প্রায়শই লেগে থাকতে পারে অপ্রত্যাশিত জীবাণু। গোসলের পর আমাদের শরীরের মরা কোষগুলো টাওয়েলের কাপড়ের সাথে লেগে থাকতে পারে যা পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়ার খাবারে পরিণত হয় যার ফলশ্রুতিতে আমরা আক্রান্ত হই বিভিন্ন রোগে।

নাসাউ কলেজ অব হাইজিন অ্যান্ড হেলথ এর সহকারী পরিচালক এলিজাবেথ স্কট-এর মতে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বাথ টাওয়েলের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। গোসলের ক্ষেত্রে এক টাওয়েল পুরো সপ্তাহ ব্যবহার না করে তিনটা বা দুটো টাওয়েল রাখা উচিত। টাওয়েল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা যেতে পারে।

- কটন, রেয়ন বা নন-ওভেন ফাইবারের তৈরি বিভিন্ন বাহারী টাওয়েল পাওয়া গেলেও সবচেয়ে স্বাস্থ্য-সম্মত হচ্ছে সর্বদা কটনের টাওয়েল ব্যবহার করা।
- নিজের ব্যবহার্য বাথ টাওয়েল সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ভালো করে পরিষ্কার করা।
- অন্য কারও সাথে নিজের ব্যবহার্য বাথ টাওয়েল ভাগাভাগি না করা, সে যতই কাছের কেউ হোক না কেন! যদি নিতান্তই করতে হয় সেক্ষেত্রে প্রতিদিন টাওয়েল পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- গোসলের পর ব্যবহৃত বাথ টাওয়েলটি কোন আর্দ্র জায়গায় না রেখে ভালোভাবে শুকিয়ে নেয়া উচিত।
- বাসায় নতুন কেউ এলে তার জন্য অবশ্যই আলাদা টাওয়েল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বাসায় থাকা বাচ্চাদের জন্য সবসময় আলাদা টাওয়েল ব্যবহার করা ভালো।
- বাথ টাওয়েল ৬ (ছয়) মাসের অধিক ব্যবহার না করাই শ্রেয়।
- বাসায় পোষা প্রাণী থাকলে বাথ টাওয়েল যথাসম্ভব তার নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

সুন্দর টাওয়েল অনেক সময় ভালো রুচির পরিচয় বহন করলেও জীবাণুরা কিন্তু সেই সৌন্দর্যে মোহিত হবে না। আপনার বাসার টাওয়েলটিকে তাই সুস্থ রাখুন, নিজেও সুস্থ থাকুন! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

সবজি-বিরিয়ানির প্রেম!

সেদিন ছিল শনিবার। সন্ধ্যা। অফিস ছুটি। আমার দুপুরে ঘুমাবার অভ্যাস তেমন নেই, তারপরও কেমন করে যেন সেদিন দুপুরে বিছানায় শুয়ে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি। করবার তেমন কিছুই ছিল না আসলে। ঘুম ভাঙে কলিং বেলের শব্দে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই সাথে অল্প অল্প মেঘ আর দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি। পার্থ এসেছে, ওর হাতে বাজারের ব্যাগ। ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে এলো বাজারে আসা নতুন চেরি, মিষ্টি দই, পনির আর এক গোছা কদম ফুল। ওর ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিটা ভেজা। কোঁকড়ানো লম্বা চুল বেয়েও চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়ছে। ঘড়ি দেখলাম, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল বাইরে খেতে যাওয়ার উপায় নেই। কেন যেন মনে হল পার্থর জন্য কিছু রান্না করি, প্রথমেই মাথায় খেলে গেল সবজি বিরিয়ানির নাম! রান্নাঘরে ঢুঁ মেরে দেখলাম বানাবার সবকিছুই কমবেশি আছে।

আমি কখনই বিশ্বাস করি না যে সমপ্রেমী হওয়া বা না হওয়ার সাথে রান্নার কোনো সম্পর্ক আছে। বাড়িতে মা রান্নাঘরে কি করতো সেই বিষয়ে কখনোই তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না আমার। প্রথম বাধ্য হয়ে রান্নার আয়োজন শুরু করি যখন আমি একা থাকা শুরু করি। আর তারপর যখন আমার যৌবনে আমি আর একা রইলাম না, তখন ব্যাপারটা আরও পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে শুরু করে।

দুজন মানুষ একত্রে থাকলে যতো যাই করি না কেন, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে অন্য মানুষটার জন্য নিজে কিছু তৈরি করি, যা পরিবেশন করার মধ্যে একটা নিজস্বতা থাকবে। এটা অনেকটা বন্ধুর জন্মদিনে নিজে হাতে তৈরি উপহার দেবার মতো। রান্নায় আগ্রহ না থাকলেও এই ব্যাপারটা বরাবরই আমাকে আকৃষ্ট করে। একটা টাওয়েল দিয়ে পার্থর মাথা মুছে দিয়ে আমি ফিজ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম, তারপর রান্না ঘর।

ও হাত মুখ ধুয়ে এসে পেঁয়াজ কেটে দিলো, সাথে মরিচ, টমেটো, শসা। এই ছিলানোর বিষয়েই আমার যতো আপত্তি আর পার্থও কিনা এই ব্যাপারেই সিদ্ধহস্ত। সাথে টুকটাক সারাদিন-এর গল্প। ল্যাপটপে তখন রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে আসছে, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে!'

প্রথমে আলু, গাজর আর ফুলকপি সিদ্ধ করে তেল-এ ভেজে তুলে রাখলাম। তেলে ভাজার সময় তাতে আরো কিছু সবজি, পেঁয়াজ কুচি, জয়ফল-জয়ত্রী, টকদই (চার টেবিল চামচ) ছেড়ে দিলাম। সবজি সেদ্ধ হবার পর যে গরম পানি রইলো, সেটা ফেলে না দিয়ে আরেকটা পাত্রে তুলে রাখলাম। বাইরে তখন গুরু গুরু মেঘের ডাক আরো ঘন হয়ে আসছে।

ভাজতে যতক্ষণ সময় লাগে ততোক্ষণে পার্থ আরেকটা পাত্রে এক কাপ পোলাওয়ের চাল ধুয়ে দিল। ধোয়ার পর মিনিট দশেক পানি ঝরাতে রেখে সেই চাল দারুচিনি দিয়ে ভেজে নিয়ে তার মধ্যে সবজি সিদ্ধের পানিটুকু (দুই কাপ) ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। পানি কমে আসলে তার মধ্যে সবজিগুলো ঢেলে দিয়ে এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম আমি। কম্পিউটারে তখন গান বদলে 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা' বাজছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। চারদিকে একটা ঠান্ডা আমেজ ছড়িয়ে পড়লো। হাতমুখ ধুয়ে পার্থ একটা বাটিতে দই বেড়ে নিয়ে এলো, এক চামচ এগিয়ে দিল আমার দিকে।

আমি প্রথম যে জিনিসটা নিজে নিজে তৈরি করতে শিখেছি সেটা হল সালাদ। দুটা করে শশা, টমেটো, গাজর আগেই কুচি করা

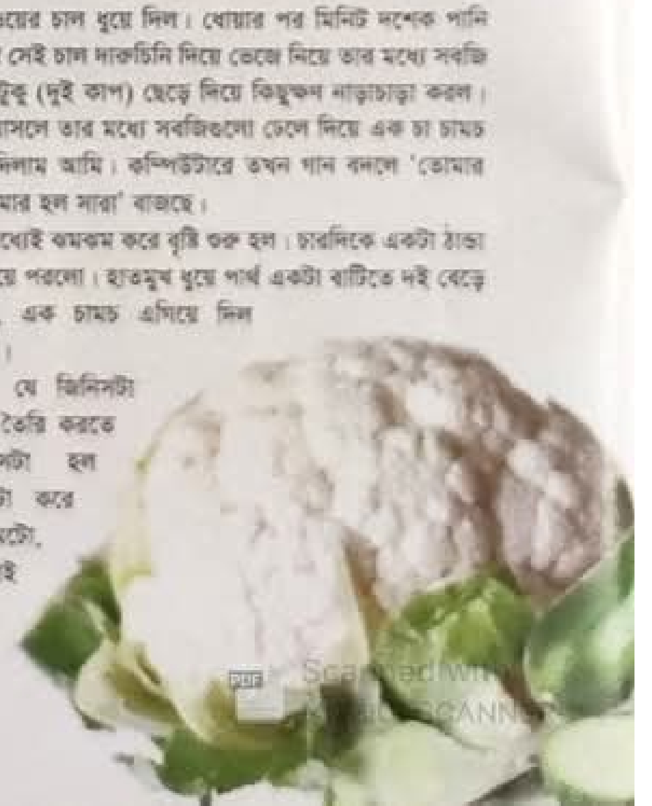

Scanned with CamScanner

পোলাউর চাল ১ কাপ, ছোট পেঁয়াজ ২টি, তেজপাতা ১টি, ঘি ২ টেবিল চামচ, লবণ ১.৫ চা চামচ, জিরা ১ টেবিল চামচ, বড় আলু ২টি, টমেটো ২/৩ টি, ফুলকপি ১কাপ, গাজর ১টি, মটরশুটি আধা কাপ, পানি ২ কাপ, কাঁচা মরিচ ৪-৫ টি, গোল মরিচ ১/৮ চা চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ।

১। আলু ,গাজর, ফুলকপি ঘি হালকা লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে ভেজে তুলে রাখতে হবে।
২। চাল ধুয়ে অন্য একটি চুলায় কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে সবজি সেদ্ধ করা পানি তাতে দিয়ে দিতে হবে।
৩। অন্য পাত্রে তেলে পেঁয়াজ, জয়ফল-জয়ত্রী, তেজপাতা একসাথে ভেজে নিতে হবে।
৪। পেঁয়াজ বাদামী হয়ে আসলে তাতে সবজি ছেড়ে দিতে হবে।
৫। টক দই এবং লবণ দিয়ে সেই সবজি ভালো করে নাড়তে হবে।
৬। শুকিয়ে আসলে এই পুরো সবজি চালের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে।
৭। মিনিট দশেক পর চাল সিদ্ধ হলে আর সবজি নরম হলে তার উপর এক চামচ ঘি ঢেলে চুলা থেকে নামাতে হবে।

ছিল। আমি খাবার ঘর থেকে একটা আপেল এনে অর্ধেকটা কিউব করে কেটে দিলাম। রান্না করতে করতে আমরা সবসময় যে কাজটা করি, কিছু একটা হয়ে আসলে দুজন দুজনের মুখে তুলে দেই জানাবার জন্য সব ঠিক আছে কিনা। সালাদের উপর ছড়িয়ে দিলাম অল্প বাঁধাকপি কুচি আর কিছু ঢাকা পনিরের কিউব। এরপর একটু কাঁচা মরিচ আর অল্প মিষ্টি দই দিয়ে ঝাঁকিয়ে নিলাম। পরিবেশনের ঠিক আগে আগে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিতে হয় যেন পানি না ছেড়ে দেয়। আর একদম উপরে বারান্দার টব থেকে কিছু ধনেপাতা এনে কুঁচি করে ছড়িয়ে দিলাম।

খাবার পরে হালকা মিষ্টি খেতে আমি পছন্দ করি। পার্থ কয়েকটা চেরি কেটে নিলো। সাথে দুইটা কলা। আগে কাটেনি কেননা ফল খুব তাড়াতাড়ি কালো হয়ে আসে। একটা বাটিতে অল্প দই নিয়ে তার মধ্যে আপেল, কলা, খেজুর আর কয়েকটা বাদাম ছড়িয়ে দিলো।

২০ মিনিটের মধ্যেই সবজি বিরিয়ানি হয়ে আসতে আসতে আমি একটা বাটিতে ২টা ডিম ফেটিয়ে নিলাম। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম গ্রেড করা অল্প একটু ঢাকা পনির, কুঁচি করা টমেটো, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ আর পরিমাণ মতো লবণ। পনির দিলে ডিমের রঙটা সুন্দর আর ফোলা ফোলা হয়! তারপর হালকা তেল এ ডিম ভেজে নিতে সময় লাগলো না।

বাইরে তখনও তুমুল বৃষ্টি।

শুরুতেই পার্থ কিছু বেগুন গোল গোল করে কেটে হলুদ, মরিচ আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিল। না ও একা নয়, আমরা দুজনে একসাথে মাখিয়েছি। কেন জানি না একত্রে এই মাখানোর ব্যাপারটা আমাদের দুজনেরই খুব ভালো লাগে। একটু বাড়তি তেল ঢেলে বেগুন ভেজে নিলাম। বেগুন নিজের মধ্যে অনেক তেল শুষে নেয় তারপরও মনে হল এমন বৃষ্টির দিনে সবজি বিরিয়ানির সাথে বেগুন ভাজা খেতে ভালোই লাগবে।

রাত ৯টা। সবজি বিরিয়ানি হয়ে আসলো। নামানোর আগে সিদ্ধ হয়েছে কিনা দেখানোর জন্য পার্থ অল্প একটু ভাত ওর হাতের তালুতে নিয়ে আমাকে চেখে দেখতে বলল। এক প্যাকেট চিপস ছিল বাড়িতে, বিরিয়ানির উপর তা ছড়িয়ে দিলাম। মাটির পাত্র করে এবার পরিবেশনের পালা।

ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চলে গেলো। পার্থ ল্যাপটপে নতুন গান দিয়ে আসতে গেল। আমি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে খাবার টেবিলে রাখলাম। ঘরে আঁধার ছিল। হাত ধুয়ে দুজনে বসলাম।

আমরা এখন মুখোমুখি। বাইরে তখন বৃষ্টি কমে গেছে। জানালার পর্দা বাতাসে অল্প অল্প কাঁপছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে টেবিলে রাখা কদম ফুলের সুবাস। শোবার ঘর থেকে ভেসে আসছে শ্রীকান্তের দরাজ গলা, '... শুধু শ্রাবণ সন্ধ্যাটুকু তোমার কাছে চেয়ে নিলাম।' ■

ছবি: ইন্টারনেট

আমার সিনেমা

আমি গল্প খুব পছন্দ করি। একটা গল্প পড়ে চোখ বন্ধ করে সেটা কল্পনার দেয়ালে ফুটিয়ে তোলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আমার। এই ক্ষমতা আরও একজনের আছে যিনি সম্পুর্ণ পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজটি করে থাকেন, তাকে আমরা পরিচালক হিসেবে জানি। যার কল্পনায় আঁকা ছবি প্রতিফলিত হয় রুপালী পর্দায়। আজকে আমরা তেমন কিছু পরিচালকের সিনেমা নিয়ে কথা বলবো যারা সমপ্রেম এবং ধর্মকে পাশাপাশি রেখে সাধারণ জীবনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের এক সফল চেষ্টা করেছেন।

দি বাবল: বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন সমপ্রেমী সিনেমা বিশ্ব দরবারে একটা পোক্ত অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে তখন পরিচালক ইয়তান ফক্স ২০০৬ সালে মুক্তি দেন তার 'দি বাবল' নামের সিনেমাটি। ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইন দ্বন্দ চলাকালীন সময়ে নিজ জীবনের প্রতিচ্ছবির আলোকে তৈরী সমপ্রেম ভিত্তিক এই সিনেমাতে ইয়তান তুলে ধরেছেন দুই ধর্মের দুই ভিন্ন পুরুষের ভালোবাসার কাহিনি। প্যালেস্টাইনের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আশরাফ নিজ দেশে নিজের সমপ্রেমী পরিচয় প্রকাশ করতে না পারার অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে বর্ডার পার করে ইসরায়েল চলে আসে যেখানে সে খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী নওম নামক এক আর্মি অফিসারের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পারিবারিক চাপের কারনে আশরাফ নিজের দেশে চলে আসলেও ভালোবাসার টানে বার বার ফিরে গিয়েছে নওমের কাছে। কখনো নওম বর্ডার পার করে গেছে আশরাফের কাছে। এরই মাঝে ইসরাইলে এক বোমা হামলা সন্দেহে তাড়া করা আসামীদের ধরতে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আশরাফের বোন মারা গেলে সে জিহাদি হয়ে ইসরাইল আসে একজন আত্মঘাতী বোমারু হয়ে আর দুজনের ভালোবাসাকে সফল করতে বেছে নেয় আত্মহননের পথ। যেখান থেকে শুরু হয়েছিল স্বার্থহীন ভালোবাসা, একটা বাবল তৈরী করতে ঠিক সেখানে এসেই সমাপ্ত হয় তা। ঝরে যায় পূর্ণতা পাওয়ার আগেই আরো দুটি প্রাণ, ঝরে যায় শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক কোন্দলের কারনে। রাজনৈতিক প্রতিকূলতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অভাবে ভালোবাসার কি পরিনতি হয় তা এই মুভিতে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ভালোবাসার এমন করুণ পরিনতি আছে পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশেই। অনেক সময় তা প্রকাশিত আর অধিকাংশে সময়ে সেগুলো অপ্রকাশিতই থাকে।

এ জিহাদ ফর লাভ: শুধু ইসরায়েল, প্যালেস্টাইন এবং বাংলাদেশের মত দেশ নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মুসলিম সমপ্রেমীদের অবস্থা খুব একটা সুখকর নয়। ভারত, পাকিস্তান, মিশর, তুর্কিস্থান, ফ্রান্স এবং আফ্রিকা ঘুরে যার বাস্তব চিত্র আমাদের সবার জন্য ধারণ করে নিয়ে এসেছেন সমপ্রেমী পরিচালক পারভেজ শরমা। নজিরবিহীন প্রবেশাধীকার এবং গভীর এক সাহসীকতা নিয়ে, রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা একপাশে রেখে পারভেজ শরমা তার এই ৮১ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্রে এমন কিছু সমপ্রেমী, উভপ্রেমী এবং ট্রান্সসেক্সুয়ালকে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন যারা জানিয়েছেন সমপ্রেমী হিসেবে নিজ নিজ দেশে কেমন তাদের জীবন। সমকাম এবং সমপ্রেম নিয়ে ইসলামে যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান, সেই দিকগুলোই তিনি তার প্রামাণ্যচিত্রের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ বিষয় সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ এবং ইমামদের মতামত তুলে ধরেছেন। মুসলিম দেশগুলোতে কুরআনের আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে অনেক সময় কতিপয় মানুষ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে, নির্যাতন করে, বাধ্য করে নিজ দেশ ত্যাগ করতে। পারভেজ দেখিয়েছেন সমকামী পরিচয়ের জন্য সমকামীদের উপর নির্যাতনের কান্না শব্দ হারিয়ে কিভাবে হয়েছে বোবা আর মানবিকতা তার বিবেক হারিয়ে কিভাবে হয়েছে অনুভূতিহীন। "ইয়া আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করবেন না। আমাদের রক্ষা করুন সেই সকল কার্যকলাপ থেকে যা আপনার কাছে ক্ষমার অযোগ্য, আমাদের মন থেকে সেই কামনা দূর করে তা ভালোবাসায় পুর্ন করে দিন আর একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের মৃত্যু কবুল করুন, আমিন।" হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সমপ্রেমীদের এই দোয়াই প্রত্যেকটা মানুষকে বোঝাতে সক্ষম যে সমাজ এবং পৃথিবীর কাছে তাদের চাওয়াটা কি।

Scanned with MOBILE SCANNER

সারকামস্টেন্স: If you could be anywhere in the world, where would you be?

একজন মুসলিম সমপ্রেমী তার নিজেকে বাঁচাতে, তার সমপ্রেমকে বাঁচাতে, তার নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাতে, পৃথিবীর কোথায় যাবে? আছে কি এর উত্তর কারো কাছে? এমনি এক প্রশ্ন রেখে পরিচালক মরিয়ম কেশাভারজ তৈরী করেছেন 'সারকামস্টেন্স' নামক এক সমপ্রেমী মুভি। যেখানে মরিয়ম দেখানোর চেষ্টা করেছেন ইরানে বেড়ে ওঠা ১৬ বছর বয়সী দুই মুসলিম বান্ধবীর একজনের প্রতি আরেকজনের সমপ্রেমী ভালোবাসার এক অপূর্ব কাহিনী। আতাফি এবং শিরীন একই সাথে বেড়ে ওঠা দুই বান্ধবী, অনেকটা সময় একসাথে পার করার পর বুঝতে পারে তাদের ভিতরকার সম্পর্ক বন্ধুত্বের চাইতে কিছু বেশী যা ভালোবাসা হিসেবে তাদের কাছে ধরা দেয়। ইরানের মত রক্ষণশীল দেশে কঠোর ইসলামিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুজন তরুনীর সমপ্রেমীতা কিভাবে পরিবার এবং সমাজের রীতিনীতির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই সিনেমাটিতে।

মিক্সড কাবাব: বিশ্বের অনেক দেশে নিজের সমপ্রেমী পরিচয় নিয়ে মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে যেমন, তেমনি এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সমাজ এবং পরিবারই হচ্ছে সমপ্রেমী ভালোবাসার রক্ষক। সম্প্রতি গাই লী থিয়াস তার 'মিক্সড কাবাব' নামক মুভিতে সেই কাহিনীই সুবিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। মিক্সড কাবাব নামটা শুনলেই মনে হতে পারে এটা খাবার অথবা রেস্টুরেন্টের উপর নির্ভর কোন সিনেমা, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা না। মিক্সড কাবাব মুভিটি বেলজিয়ামের এক মুসলিম পরিবারের কাহিনি। সিনেমাটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে সমপ্রেমী ভালোবাসা একটা বিচ্ছিন্ন পরিবারকে একত্রিত করতে নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। ২৭ বছর বয়সী মুসলিম পরিবারের ইব্রাহীম আর ১৯ বছর বয়সি কেভিনের ভালোবাসার উত্থান-পতন এবং পরিবারের উপর ভালোবাসার জয়ের কাহিনিই মিক্সড কাবাব। ইব্রাহীমের সমপ্রেমী হবার কথা সমাজে জানাজানি হয়ে গেলে, পরিবারের মান সম্মান রক্ষার জন্য ইব্রাহীমের বাবা তাকে ত্যাজ্য করে দেন। অপরদিকে ইব্রাহীমের ভাই (ফুরকান) ইব্রাহীমের প্রেমিককে (কেভিন) আল্লাহর নামে জবেহ করার পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলে। পরিশেষে দেখা যায় ক্রোধ, হিংসা এবং ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে যে কেভিনকে ফুরকান হত্যা করার পরিকল্পনা করে, সেই কেভিনই নিজের জীবন বিপন্ন করে ফুরকানের জীবন রক্ষা করে ভালোবাসার এক অপূর্ব উদাহরণ উপস্থাপন করে। কোন উগ্রতা নয়, দৈহিক চাহিদা নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসার আকুতি নিয়ে করা ৯৮ মিনিটের ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি আরও একবার প্রমাণ করে যে প্রতিটি ধর্মই ভালোবাসাকে সমর্থন করে এবং ভালোবাসে ভালোবাসাবাসি মানুষগুলোকেও, তা সে যে ধর্ম, গোত্র, জাতী বা ভাষারই হোক না কেন।

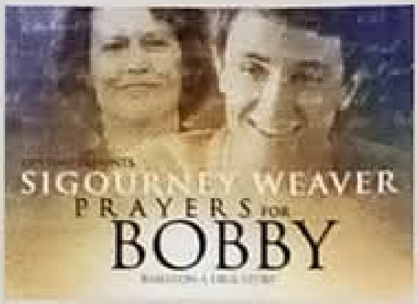

প্রেয়ারস ফর ববি: যেকোনো কিছু সহজেই গ্রহণ করে নেয়ার জন্য যা সবচাইতে জরুরী তা হলো কুসংস্কার মুক্ত হওয়া। কুসংস্কার মুক্ত না হলে তার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে সেটাই দেখানো হয়েছে রাসেল মুলচাহ এর 'প্রেয়ারস ফর ববি' নামক সিনেমাতে। সমপ্রেমীতা সম্বন্ধে ধার্মিক কুসংস্কারচ্ছন্নতার খুব সুন্দর উদাহরণ প্রেয়ারস ফর ববি নামক মুভিটি। সত্য ঘটনার উপর নির্মিত এই সিনেমাতে পরিচালক দেখিয়েছেন সমপ্রেমকে সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ, শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতা মনে করে এক ধার্মিক মা কিভাবে তার সন্তানকে সমপ্রেম থেকে ফেরানোর জন্য মানসিকভাবে নির্যাতন করেছেন। ববির সমপ্রেমী হওয়ার প্রতি তার পরিবারের যে অসযোগীতা, ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গি তাতে শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়ে তার শোধ দিতে হয়েছে ববিকে। যদিও সিনেমার শেষে গিয়ে দেখা যায় ববির মৃত্যু নতুন করে ভাবাতে শেখায় তার মা কে। ধর্ম আর সামাজিকতার নিক্তিতে চড়িয়ে ছেলের জীবনের বিনিময়ে তার মা খুঁজে পায় মানুষকে ভালোবাসার এক নতুন দিগন্তের।

ছবি: ইন্টারনেট

Scanned with MOBILE SCANNER

রূপবান সংবাদ

নেদারল্যান্ড ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন জিএইচআরডি (Global Human Rights Defense) এর উদ্যোগে গত ১৮ থেকে ২২শে মে হয়ে গেল সংখ্যালঘুদের অধিকার বিষয়ক কর্মশালা যেখানে মূলত ধর্মীয়, জাতিসত্ত্বা ও যৌন প্রবৃত্তির উপর কাজ করছে এমন ১১ টি সংগঠন অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা শেষে সংগঠনগুলোর একটি 'অ্যালায়েন্স' তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। উল্লেখ্য 'জিএইচআরডি' এর আগে বাংলাদেশে যৌন সংখ্যালঘুদের উপর একটি জরিপ চালনা করছে যার ফলাফল খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

১৭ই মে দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রণয়নামা ২। সমকাম ভীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতেই 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপন করে থাকে। গল্প পড়ে শোনাবার পাশাপাশি এবারের প্রণয়নামাতে মূল উপজীব্য ছিল সমপ্রেমীদের লেখা চিঠি আর ক্ষুদেবার্তা। অপেশাদার সদস্যদের মাঝে আত্মবিশ্বাস এবং দলীয় চেতনা তৈরি করা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সমকালীন আলোকচিত্র শিল্পী গাজী নাফিস আহমেদের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী "সহজাত সত্য" গত ১০ই মে, ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে শুরু হয়। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহযোগিতায় ৮ দিনব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনীতে বাংলাদেশী সমপ্রেমী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে তুলে ধরা হয়।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে মোট আলোকচিত্রের সংখ্যা ১৩৪টি। প্রদর্শনীটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনাব ড্যান ডব্লিউ মজিনা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত জনাব গেরবেন সর্জড ডি জং। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মেরেথে লুণ ডিমো, UNIDS-এর প্রধান জনাব লিও কেনি, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রধান জনাব সালেহ আহমেদ। জনাব ড্যান ডব্লিউ মজিনা, নাফিস আহমেদ সম্পর্কে বলেন "যেখানে মানুষ সমস্যার গভীরে যেতে ভয় পায়, নাফিস সেখানে সমস্যার গভীর থেকে গভীরতর জায়গায় যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তিনি সমকালীন আলোকচিত্র শিল্পীদের গুরু।" শিল্পী নাফিস তার প্রদর্শনী সম্পর্কে বলেন, "আমরা মানুষ, জন্মগতভাবে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছি, আমাদের উপর কোনো কিছু আরোপিত নয়। আমি আগেও এই বিষয় নিয়ে কাজ করছি কিন্তু এইবার আমি সমপ্রেমী মানুষদের জীবনকে রঙিনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"

'বয়েজ অব বাংলাদেশ'-এর নিয়মিত আয়োজন 'আড্ডা' এবং মানসিক সহায়তার জন্য অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়ার আসর 'আমরা আছি' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ৩রা মে এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারি। এবারের আড্ডার বিষয়বস্তু ছিল 'সমাজের কি আমাদের সম্পর্কে জানা উচিত।' নানান তর্ক বিতর্ক আর মতামতের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাস আর একে অন্যের বৈচিত্র্যকে সহনশীলতার সাথে উপলব্ধি করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। আগামী আড্ডা আবার অনুষ্ঠিত হবে ৬ই সেপ্টেম্বর।

২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় 'এমডিএসএস সিনে ক্লাব'-এর আয়োজনে হয়ে গেল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 'প্রেয়ারস ফর ববি'। ছবির প্রেক্ষাপট আশির দশকের আমেরিকা। একজন হাই স্কুল পড়ুয়া সমপ্রেমীর আকস্মিক আত্মহত্যা এবং অতঃপর তার মায়ের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে এই আমেরিকান ছবির কাহিনী। অনলাইনে চলচ্চিত্র সমালোচনা ছাড়াও 'এমডিএসএস সিনে ক্লাব' মূলত চাহিদা-এর ভিত্তিতে ডাকযোগে সবার কাছে চলচ্চিত্র পৌঁছে দেয়ার কাজ করে থাকে।

১৭-১৮ এপ্রিল সাভারে বিসিডিএম-এ ছেলেদের সেবা করা বা যত্ন নেবার প্রবণতা নিয়ে ভিন্ন এক চিত্র-কর্মশালার আয়জন করা হয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) বিভাগের Center for Gender and Social Transformation (CGST) এই কর্মশালার আয়জন করে। ভিন্নরূপে পুরুষ/কেয়ারিং ম্যান শিরোনামে এক চিত্রপ্রদর্শনী-এর প্রস্তুতি হিসেবে এই কর্মশালার আয়জন করা হয়। পুরুষেরাও যে সেবা করতে পারে, পরিবার বা অন্যান্যদের প্রতি তাদের যে সংবেদনশীলতা কিংবা দায়িত্বশীল মমতা রয়েছে, সেই বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

Scanned with MOBILE SCANNER

ষড়ঋতুর ছয়টি রঙ আর বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে গত ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রার অংশ হিসেবে পালিত হয় বর্ণাঢ্য রঙধনু শোভাযাত্রা। বন্ধুত্ব, বৈচিত্র্য আর ভালোবাসাকে উদযাপনের জন্য বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো এমন একটি আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। চারুকলার উল্টা পাশ থেকে শুরু করে রূপসী বাংলা পর্যন্ত রঙ বেরঙের ফুল, পাখি সম্বলিত এই শোভাযাত্রাটি উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আকর্ষণ তৈরি করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শোভাযাত্রাটি অনেকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।

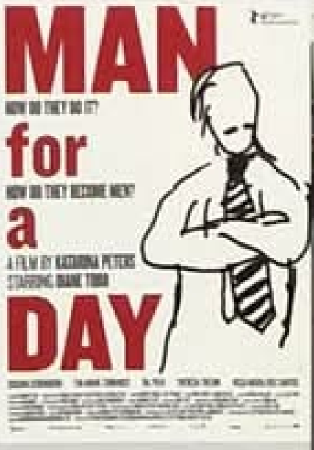

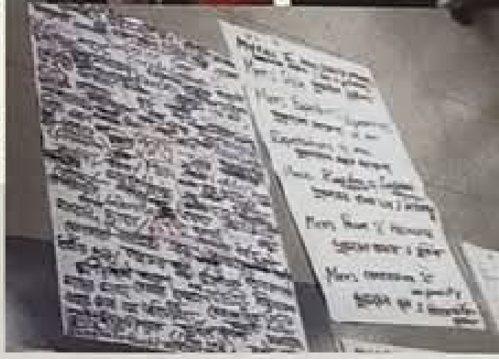

জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আমন্ত্রণে দক্ষিণ এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে গত ১১ই মার্চ বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রশিক্ষক কাটারিনা পিটারস ও জার্মান শিল্পী ডায়ান টোর তাদের কর্মশালার উপর নির্মিত তথ্যচিত্র 'ম্যান ফর এ ডে' প্রদর্শনী করে গেলেন। মূলত তাদের কর্মশালার অংশগ্রহণকারী নারীদের একজন পুরুষ হিসেবে তৈরি করা আর তাদের সমাজের সামনে উপস্থাপন করাই ছিল এই তথ্যচিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন পুরুষ কিংবা নারী কিভাবে সমাজের শেখানো আচরণগুলোর মধ্য দিয়ে নারী বা পুরুষ হয়ে উঠে তা উপলব্ধি করাই ছিল এই কর্মশালার লক্ষ্য। আগামী নভেম্বরে নতুন কোনো কর্মশালার জন্য তারা বাংলাদেশে আবার আসবেন।

গত ১৫ই মার্চ ছিল অনলাইন ভিত্তিক গ্রুপ 'হোমোসেক্সুয়ালিটি ইস নট এন ইলনেস'/হিনাই এর দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। রাজধানীর একটি রেস্তোরায় নাটক, গান আর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বারের মত উজ্জাপিত হয় এই অনুষ্ঠানটি। 'হিনাই' মূলত একটি ফেসবুকভিত্তিক অনলাইন গ্রুপ যেখানে সমকামিতা যে কোনো মানসিক অসুস্থতা নয় সে ব্যাপারে প্রচারণা চালানো হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে গত ৮ই মার্চ উল্লেখযোগ্য ছিল ভি ডে (VDay) ঢাকা আয়োজিত 'ওয়াক এ মাইল ইন হার সু'। এছাড়াও নারীপক্ষ আয়োজন করেছিল একটি আলোচনা ও সেই সঙ্গে পরিবেশনা যার মূল উপজীব্য ছিল বিবাহ পরবর্তী ধর্ষণ। 'ইউএন ভলান্টিয়ার্স' এবং 'ইউএন ওমেন'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নারী অধিকার শীর্ষক কাজের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠক।

'ইউএন ভলান্টিয়ার্স'-এর উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল 'ইয়ুথ ভলান্টিয়ার ডে' মেলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত এই মেলায় রূপবান অংশগ্রহণ করে।

নগরীতে নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'গার্লস টক'। গত ডিসেম্বরে প্রথম একটি ওয়ার্কশপ এর মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে এই আয়োজন যার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারা আমন্ত্রিত অথিথিদের জন্য প্রদর্শন করে আমেরিকান চলচ্চিত্র 'ইফ দোস ওয়ালস কুড টক ২'।

বিগত ৭-৯ ফেব্রুয়ারী সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশন এবং শিল্পকলার যৌথ আয়োজনে হয়ে গেল ঢাকা আর্ট সামিটে'র দ্বিতীয় আয়োজন। এই আয়োজনে শিল্পকলার তৃতীয় তলায় শিল্পী মাহবুবুর রহমানের 'এ স্পেস ফোর রেইনবো' (রংধনুর জায়গা) নামক চার চ্যানেলের দৃশ্য, শব্দ এবং প্রতিলিপি প্রদর্শনী।

বাংলাদেশে সমপ্রেমী অধিকার আদায়ের পক্ষে যারা কথা বলেন, শিল্পী তাদেরকে যোদ্ধা হিসেবে মনে করেন, তবে সেই যুদ্ধ শান্তির পক্ষে যুদ্ধ। সাধারণ যোদ্ধারাও শান্তিপ্রিয় এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে সমতা আদায়ের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রদর্শনীতে রহমান যোদ্ধাদের জন্য এমন একটি সাজঘর তৈরি করেন যেখানে পুরুষের জন্য তৈরি মূত্রাধার রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো সকল মূত্রাধার এক্ষেত্রে সার্জিক্যাল কেঁচি দিয়ে তৈরি যা কিনা শিল্পীর চোখে পুরুষত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। শিল্পী বলেন "এই ঘরটি তৈরির মূল কারণ হলো একজন যোদ্ধাকে প্রেমিকে পরিণত করা, প্রাত্যাহিক ধ্বংসাত্মক জীবন থেকে আলাদা করে একটু সুখ শান্তিতে শ্বাস নেবার জায়গা করে দেয়া।"

চট্টগ্রামে 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন' এর আমন্ত্রণে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'বয়েস অব বাংলাদেশ'র একটি কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠান। লিঙ্গ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে কি করে এই বিষয়ে কাজ করা যায়, তাই ছিল এই আলোচনার মূল উপজীব্য। পরবর্তীতে বিগত ২৪ মে 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন' বাংলাদেশে প্রথম SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) বিষয়ক তিন দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে।

গত ১৮ই জানুয়ারী বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠলো রূপবানের। বাংলাদেশের প্রথম সমপ্রেমভিত্তিক এই ম্যাগাজিন যাত্রা শুরু করে এইদিন থেকে। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সারা হোসেনে ছাড়াও সুশীল সমাজ থেকে আরো অনেকের উপস্থিতি সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। রূপবান বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সমপ্রেমভিত্তিক ম্যাগাজিন। ■

Scanned with CAMSCANNER

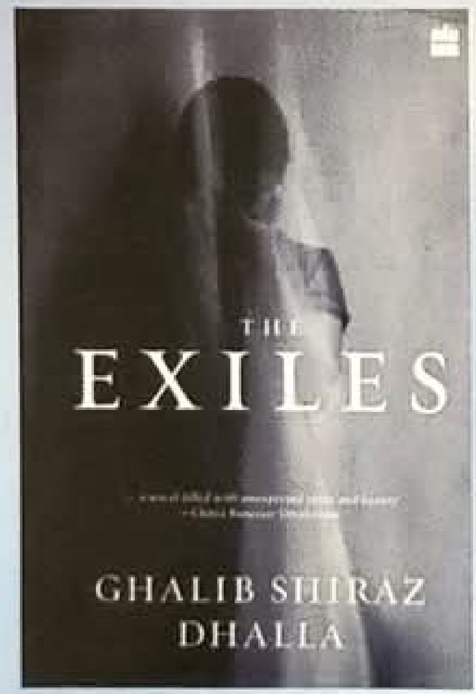

দি এক্সাইল

কেনিয়ার মোম্বাসাতে জন্ম নেয়া লস এঞ্জেলস ভিত্তিক লেখক গালিব সিরাজ ডাল্লার দ্বিতীয় বই 'দি এক্সাইল'। উপন্যাসটি ২০১১-তে 'টু কৃষ্ণা' নামে মুক্তি পেলেও ভারতে 'দি এক্সাইল' নামেই প্রকাশিত হয়। লস এঞ্জেলস-এর কোনো এক ব্যাংকে এ চাকরিরত রাহুল কাপুর তার চাকরি এবং লম্বা বৈবাহিক জীবন নিয়ে বীতশ্রদ্ধ। সময়ের কোনো এক প্রান্তে রাহুল প্রেমে পড়ে আতিফ নামক অন্য এক পুরুষের। পুরো গল্প জুড়ে পুজা আবিষ্কার করে তার স্বামীর এই বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমকে। অন্য কোনো মেয়ের কাছে না গিয়ে অন্য এক পুরুষকে ভালোবাসার জন্য বেছে নেয়া, নিজের সমকামী ভীত কলেজ পড়ুয়া ছেলের কাছে লুকনো যে তার বাবা নিজেই এরকম মানুষদের একজন কিংবা নিজের স্বামীর ভিন্ন এক সত্ত্বাকে আবিষ্কার, পুরো গল্প জুড়েই পুজার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উঠে এসেছে সম্পর্কের অনন্য এক টানাপোড়েন। ভারতের মুম্বাই, কেনিয়া এবং আমেরিকা-এর পটভূমিতে লেখা উপন্যাসের পাতায় পাতায় উঠে এসেছে ভালোবাসা, কামনা, প্রতারণা, খুন কিংবা আত্মহত্যার মতো বিষয়গুলি। ভারতীয় সুফিবাদ এবং হিন্দু দর্শনের মিশেলে তৈরি এক অনন্য নারী চরিত্রের চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে। নতুন দিল্লি ভিত্তিক প্রকাশনা হার্পার কলিন্স থেকে প্রকাশিত ৪০৬ পৃষ্ঠার বইটির দাম ৩৫০ রুপি।

নীল যমুনার জলে

নারী আর পুরুষের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে খুবই স্বাভাবিক। সাধারণত এমনটাই হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের নানা ধরণের সম্পর্ক নিয়ে লেখাও হয়েছে অসংখ্য বই। তবে সমলিঙ্গের নারী বা পুরুষের প্রেম ও বিয়ের সম্পর্কের বিষয়টি বাংলাদেশী সাহিত্যে সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। চলতি বছর সমলিঙ্গের দুই নারীর প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে বেরিয়েছে উপন্যাস 'নীল যমুনার জলে'। বইটি লিখেছেন লেখক-সাংবাদিক তৌহিদুর রহমান।

'নীল যমুনার জলে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোমা, যিনি একজন কলেজ ছাত্রী। গল্পের অন্য চরিত্রটির নাম রেহানা যিনি কিনা একজন কলেজের শিক্ষিকা। এই দুই চরিত্রকে ঘিরেই এগিয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। সোমা কিংবা রেহানা, এদের কারোরই পুরুষের প্রতি কোনো টান নেই, নেই কোনো আকর্ষণ। তারা দুজনেই নারীসুলভ কমনীয়তা প্রত্যাশী, মেয়ে হয়েও অন্য মেয়েদেরকেই তারা সঙ্গী হিসেবে খোঁজে। উপন্যাস জুড়ে এদের সেই অদম্য টানই যেন এদেরকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসে, তৈরি হয় ভালোবাসা। সমাজ মেনে নেবে না জেনেও তারা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকে একসাথে থাকার। ভালোবাসার প্রাবল্যে একদিন গোপনে মালাবদল করে বিয়ে করে তারা, তবে সেই বিয়ের খবর কোথাও চাউর হয় না। এভাবেই বয়ে চলে দুই জীবন। বইটি বাংলা ভাষায় প্রথম সমপ্রেমী উপন্যাস না হলেও এই ধরণের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। লেখক বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশে অনেক সমপ্রেমী নারী-পুরুষই রয়েছেন আর সেটা থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার জন্যই সমপ্রেমী নারী-পুরুষরা এখানে নিজেদের আড়ালে রাখতে বাধ্য হন। সমপ্রেম কোনো প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ নয়, বরং আর দশটা সম্পর্কের মতোই যে স্বাভাবিক, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে।

বইয়ের ফ্লাপে অবশ্য বলা হয়েছে, বইটি শুধুমাত্র প্রাপ্তমনস্ক পাঠকদের জন্য। তবে লেখকের আশা একদিন দেশের সব পাঠকই হবেন প্রাপ্তমনস্ক পাঠক। বইটি প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিপ্রকাশ থেকে। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ

পরিবর্তন কি আসবে?

গত ২৩ মার্চ ধানমন্ডির ই.এম.কে সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং টির্থংকি মিডিয়াটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর যৌথ প্রযোজনায় প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী 'পরিবর্তন কি আসবে? (উইল দিস চেঞ্জ)।' মূলত হিজড়া জনগোষ্ঠীদের সমাজে, বাড়িতে, বিদ্যাপিঠে বা কর্মক্ষেত্রে অবহেলিত হবার ইতিবৃত্ত নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনি। প্রামাণ্যচিত্রটিতে কয়েকজন হিজড়া এবং সমকামী পুরুষের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। নাচিয়ে হিসেবে তাদেরকে অপদস্থ করা, ইপিজেডের চাকরি থেকে ছাটাই কিংবা পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার মতো প্রসঙ্গগুলো কাহিনিচিত্রে উঠে আসে। হিজড়াদের বাড়ি ভাড়া না দেয়া কিংবা বেশি টাকায় চিকিৎসা সেবা দেয়া ছাড়াও এতে তাদের জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণের স্বপ্নের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। অনুরুপা প্রকাশ এবং লোক প্রকাশের যৌথ পরিচালনায় এই চলচ্চিত্রে চিত্রগ্রাহক ছিলেন দেবলিনা। উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় পরিচালক লোক প্রকাশ, বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এবং ছবির কলাকুশলীসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের শেষে চলচ্চিত্রে অংশ নেয়া শিল্পীরা তাদের অনুভূতির কথা জানান। চলচ্চিত্রটি 'মুম্বাই কুয়্যার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে' বিগত ২৪ মে অংশগ্রহণ করে।

ডোন্ট আস্ক, ডোন্ট টেল

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি-এর মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক ভিন্নতর 'লাইভ আর্ট পারফরম্যান্স'। বেন হে রিপ এবং নাভাটেজ এস জোহার-এর যৌথ পরিচালনায় এই পরিবেশনার মূলে ছিল পুরুষের যৌন আকর্ষণ, চাহিদা, একাকীত্ব আর প্রত্যাখ্যানের এক অনন্য আখ্যান যার বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়া আর ইউরোপের মানসিক ভিন্নতা কিংবা সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে। জার্মান-ভারতীয় যৌথ পরিচালনার এই অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রদর্শিত শিল্প মাধ্যমের সীমানা প্রসারণের চেষ্টা করা হয়েছে। শব্দ, ছবি, অনুভূতি এবং গতি এই চারই পুরো প্রদর্শনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ছয়জন প্রদর্শক, নাচিয়ে, গায়ক এবং বাজিয়ে ছিলেন মঞ্চের মূল নিয়ন্ত্রণে। পুরো উপস্থাপনায় আধুনিক মঞ্চসজ্জার অনুষঙ্গ হিসেবে 'শরীর'কে প্রাধান্য দেয়া হলেও প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যতা পুরোটা অনুষ্ঠান জুড়েই অক্ষুণ্ণ ছিল। কাব্যিক নাটকীয়তা, ভবিতব্য, সৌন্দর্য্য আর যৌনতার অপার্থিব ব্যাখ্যা, সবটা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় অনুষ্ঠানে। অসাধারণ মঞ্চ পরিকল্পনার সাথে সাথে আলো এবং শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার দর্শকদের সম্মোহিত করে রাখে। যৌন সংবেদনশীল বিষয়ের উপস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ■

ভার্চুয়াল: দুটি সর্বনাম

১

আমার প্রতি তার আবেগটা আসলে কি রকম ছিল সেটা আমি বর্ণনা করতে অপারগ; সে কি নিজ উদ্যোগে কোনোদিন আমাকে নিয়ে ভেবেছে? আমাকে সে কি মনে করতো? বোকা? পাগল? লোভী? উটকো আপদ? আমি জানি না। আমার প্রতি তার মনে যদি সম্ভ্রম জাগতো অথবা বিরক্ত হতো আমার আচরণে, কোনোটাই সে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতো না, আমি সেসব অনুমান করে নিতাম। সব থেকে বেদনার ব্যাপার ছিল, আমাকে নিয়ে তার মাঝে কোনো কৌতূহল ছিল না, তার মানে এই না যে, সে আমাকে বুঝতে পারতো; আমাকে বোঝার বা নিজেকে বোঝানোর কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছা তার মাঝে আমি দেখিনি। তার জীবনে আমাকে একদমই প্রয়োজন ছিল না, তবু কেন যে আমাকে সে সহ্য করতো! কাউকে করুণা করার যোগ্যতাও তার ছিল না। তাহলে? তবু কোন ললিত মায়ায় আসক্ত হয়ে আমি তার সাথে নিজেকে জুড়ে রাখতাম! কতোবার যে তার নাম্বার আমি ডিলেট করেছি! সেন্ট আইটেম থেকে তাকে পাঠানো এসএমএস-এর সূত্রে সেই ফেলে দেওয়া নাম্বার আবার যোগাড় করেছি, আবার ফোন দিয়েছি, আবার অভিযোগ করেছি ... খুব সামান্য হলেও তার দিক থেকেও তাগিদ ছিল; একে তার বৌ-এর সাথে থাকার সুযোগ সে পেত না, সেই সুযোগ যখন হলো, ফ্যামিলি নিয়ে থাকার জন্য সেনানিবাস থেকে ফ্ল্যাটের বরাদ্দ পেল, তখনো পুরুষ শরীরের প্রতি তার আগ্রহ ফুরিয়ে যায়নি, যদিও আমার শরীর আকর্ষণীয় নয় কিন্তু আমি ছাড়া বারবার বেহায়া বিড়ালের মতো কে তার কাছে ধন্না দিত। আর নিজের প্রয়োজনের জন্যেও কারো কাছে ধন্না দেওয়ার স্বভাব তার নেই, তার আত্মসম্মানবোধ খুব সূক্ষ্ম; আর আমি জীবনে প্রেমকে এতো মূল্য দিয়ে রেখেছি যে প্রেমের ন্যূনতম সম্ভাবনায়, প্রেমের বর্বর আকাঙ্ক্ষায় আত্মমর্যাদাকে পোশাকের মতো খুলে ফেলে ল্যাংটা হয়ে যেতে পারি, আমি প্রেমের পূজায় ব্যক্তিত্বের বলি দিয়েছি; অবশ্য আত্মমর্যাদার ক্ষতি করে প্রেম আদৌ সম্ভব কিনা এ নিয়ে এখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। দ্বিতীয় কারণ, আবেগের একটা মাধ্যাকর্ষণ থাকে যেই টান কেউ পাশত না হলে আমূল উপেক্ষা করে থাকতে পারে না; আরেকটা কারণ হলো, তার আত্মপ্রেমকে আমি ঈষৎ বেশি সম্মান দিতাম যাতে সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

প্রেমের স্বাদ আমি জানি না, অপ্রেমের স্বাদ চিনি; তাকে নিয়ে কয়েকটা দিনের মিষ্টি ভ্রম ছাড়া বাকিটা সময় আমি বুঝতে পেরেছি এখানে প্রেম নেই এবং এখানে প্রেম অসম্ভব, এতে তাকে নিয়ে আমার উদ্বেগ ও অস্থিরতা ম্লান পায়নি, তার টানা নির্বিকারত্ব সেই অস্থিরতা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিয়েছে; সে ফোন দিত না, আমি তার ফোনের জন্য অপেক্ষা করতাম।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে অপেক্ষা করি, যুক্তি দিয়ে ভাবি, হয়তো ওর ডিউটি তখনো শেষ হয়নি, তাই আবার নতুন করে সময় নির্দিষ্ট করি, যখন সেই সময়ও পার হতে থাকে আমিই তাকে ফোন করি, ওপার থেকে কেউ ধরে না; একবার, দুইবার... আর না, তবু খানিক বিরতি দিয়ে তৃতীয় বার ফোন করি; সে ধরে না; আমি অপেক্ষা করতে থাকি, হয়তো যেকোনো সময় তার ফোন আসবে, আমার ফোন না ধরার কারণ ব্যাখ্যা করবে, কিন্তু প্রত্যাশিত কোনো ঘটনাই ঘটে না, তখন বাধ্য হয়ে অনেকটা উপসংহারের মতো তাকে এসএমএস পাঠাই :

'দিন-রাত ডিউটি থাকে নাকি! ফোন করছেন না, ধরছেনও না, কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি আমার আচরণে কোনো ভুল হয়েছে; আমাকে জানান প্লিজ।'

আমার দুর্ভাগ্যও, সে ফোন করলো সেই রাতেই;

- কী খবর; কেমন আছেন?

- ভালো তো, বেশ ভালো, আপনি কেমন? (এ হলো মুখোশ পরা দুঃখের পরিমিতিবোধ)

- ডিউটি করতে করতে জান শেষ ভাই; আর আপনি কি সব লিখে পাঠাইছেন?

আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম না বরং তাকে বললাম, যান; মেসে গিয়া বিশ্রাম নেন।

- মেসেই যাচ্ছি; তো আপনার অস্থিরতা কমেছে?

আমি এই প্রশ্নেরও উত্তর দিলাম না, যেন এই প্রশ্ন একান্ত ভিত্তিহীন। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললাম

- বৌদিরে এখানে নিয়ে আসেন, আপনার তাতে সুবিধা হবে।

- তাই! তাহলে আপনার অস্থিরতা কাটবে?

জাঁহবাজ শিকারীর মতো এই প্রশ্নটা করে একটু হাসল; তারপর আবার বলল, আনবো। একটু সময় লাগবে। আপনার কথা বলেন ...মনে মনে বললাম, আমার কথা আর কী তোমাকে বলি! মুখে বললাম, এইতো।

ধীরে ধীরে কৌতূহলকে সেনাপতি বানিয়ে আমি যে তার সাথে ঠান্ডা যুদ্ধ করছিলাম তার অবসান হলো, আমার কথার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে বেসামাল, বাঁচাল হয়ে উঠল।

- আপনি বিবাহিত; জানি না উচিত কিনা, আপনার জন্য কি রকম একটা অনুভূতি যেন আমার মনে কাজ করে, ঠিক বোঝাতে পারবো না, হয়তো প্রেম নয়, তবু কি যেন... এবার উভয়পক্ষের জন্য সর্বাধিক ভালো উত্তরটাই সে বাছাই করা নিল; আসলে উত্তর হিসাবে সে আমার সামনে রাখল একটি নৈর্ব্যক্তিক আয়না, 'নিজেকে প্রশ্ন করেন।' তারপর কানে বাজে এমন নীরবতা মাঝখানে রেখে সে কথার জাল গুটিয়ে নিল, 'ঠিক আছে, আজ যাক, কালকে আবার কথা হবে। কেমন?'

২

শুরু থেকেই জানতাম সে বিবাহিত। কবে? এইতো, 'রিসেন্ট'। ইন্টারনেটের খাতা পেরিয়ে প্রথম দিন দ্রুতই ফোনের আলাপ শেষ হয়েছিল। তার ব্যাপারে সব শুনে আমি আমার পক্ষ থেকে সম্পর্ক নির্মাণের জন্য জরুরি অগ্রহকে কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। আমার নৈতিকতা বিবাহকে তেমন কোনো মূল্য দেয় না। তবুও তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। তার প্রতি আমার প্রথম মনোভাব ছিল কিছুটা নিরাসক্ত কৌতূহলের, যার আড়ালে সাপের মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে ছিল অলস লোভ। পরের দিন

Scanned with MOBILE SCANNER

সেই-ই ফোন দিল, তারপরের দিনও। এতোটা আমি প্রত্যাশা করিনি, কিন্তু এই সামান্য অজুহাতে আমার লোভ গা ঝাড়া দিয়ে সজাগ হলো, সুযোগ বুঝে একে একে ফুটতে লাগল কামরাঙ্গা ফুলগুলি। তৃতীয় দিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তার ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম, সে ফোন দিল না নির্দিষ্ট সময় পার হবার পরেও। আমিই ফোন দিলাম, পরাজয়ের সেটা কেবল সূত্রপাত!

আপনারা হয়তো ভাবছেন, একটা নীতি-গর্হিত প্রেমের ভূমিকা তৈরি করেছি আমি; ভালোই হতো যদি গতানুগতিক প্রেম কাহিনির মতো, ত্রিভুজ জটিলতার একটি বাহু হওয়ার ভাগ্য আমার থাকত, কিন্তু বাস্তবতা অনেক জটিল। হ্যাঁ, আমি তার প্রেমে পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রেমের ইচ্ছা আর প্রেম তো এক নয়; তার প্রতি আমি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম, সে যখন আমার ফোন ধরতো না আমি অস্থির হয়ে পড়তাম, যদিও জানতাম তার ডিউটিটাই এমন যে সে ইচ্ছে করলেই যেকোনো সময় আমার ফোন রিসিভ করতে পারতো না। আমি জানতাম কিন্তু মানতাম না, আমি ভাবতাম সে বুঝি আমাকে উপেক্ষা করছে বা আমার প্রতি তার কোনো প্রকার আগ্রহ নেই; আমার উদ্বেগ পুরোপুরি ঠিক ছিল না আবার একেবারে ভুলও ছিল না, কারণটা আগেই বলেছি, আমার প্রতি তার আবেগটা আমি কোনোদিন ধরতে পারিনি।

অনেকবার তাকে মুছে দিতে চেয়েছি জীবন থেকে। কিন্তু ওর কাছ থেকেই আবার ফোন আসতো। সেই সব ফোন পাওয়ার পর আমি আপাদমস্তকে অনুভব করতাম যে, আমি এ কয়দিন ডাঙ্গায় পড়ে থাকা জিয়ল মাছের মতো বেঁচে ছিলাম, এখন আমার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়েছে; তাই এ কয়দিন কি রকম বেঁচে ছিলাম, মনে মনে কি কি প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম, কিভাবে তাকে আমার মোবাইল ও মন থেকে চিরতরে 'ডিলেট' করে দিতে চেষ্টা করেছিলাম, সব গড়গড় করে তাকে বলে দিতাম। সে হালকা করে শুনত। আমি চক্রব্যূহে আটকা পড়ে থাকতাম! তুমি কি চাও, তোমাকে নিয়ে আমার আবেগ বিপজ্জনক বিধায় তা ছেটে ফেলার প্রয়াসকে শাবাশি দাও? বল, তাহলে কেন তুমি আমাকে ফোন করেছ, ছেলে? এই কথাগুলো তাকে বলিনি কোনোদিন, তখন তার ফোন পেয়ে আমি এতোই উত্তেজিত থাকতাম যে কি বলছি, কেন বলছি এবং তার প্রত্যুত্তরে সে কি ইঙ্গিত করছে, তা বিচার করার অবকাশ ছিল না।

৩

নিজের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিবর্তন না এনে তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সে আমার জন্য করেছে; ফ্ল্যাট পাওয়ার পর যখন সে একা থাকত, অর্থাৎ যখন তার বৌ থাকত না, তখন আমাকে সে তার ফ্ল্যাটে যেতে দিয়েছে; আমরা এক সাথে সিগারেট ফুঁকেছি; নেট ব্রাউজ করেছি; একদিন সে আমার জন্য ফার্মের মুরগি পর্যন্ত রান্না করেছিল, আমরা এক সাথে খেয়েছি; এক সাথে একই বিছানায় শুয়েছি; চূড়ান্ত ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার আগে সে আমাকে তার ঠোঁটে চুমো দিতে দিতো, তার বুকে মুখ ঘঁষতাম, জিবের ডগা দিয়ে আমি সেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতাম। সে মেনে নিতো। তার শরীরের ঘ্রাণ নিতাম। এসবই তার দয়া; দুই হাতের অঞ্জলিতে তার মুখমণ্ডল ধরে আমি দেখতাম তার গম্ভীরতা; 'তুমি হাসো না কেন? তোমার মুখে খুশি নাই কেন? তুমি গম্ভীর হয়ে আছ কেন?' আমি এসব প্রশ্ন তাকে করতাম; সে অস্বীকার করে একটু হাসতো!

আর তারপর? শীর্ষে পৌছাবার পর তাকে চুমো দিতে চাইলে সে বিরক্তি প্রকাশ করত, তার বাহু জড়িয়ে ঘন হতে চাইলে সেই শরীর যেটা একটু আগে আমাকে সহ্য করেছিল, সেটা আর কোনো খাতির করতো না। এভাবে বিকেল ঘনিয়ে আসলে তার ডিউটিতে যাওয়ার সময় হয়ে যেত, তখন আমাকে চলে আসতে হতো। আমি আবদার করতাম, 'আমি যাব না। আজ রাতে তোমার বাসায় থাকবো।' সে যুক্তি দেখাতো, 'আমি তো ডিউটিতে চলে যাব, তুমি কীভাবে থাকবে?' আমি বলতাম, 'তুমি যাও; আমি একাই থাকব।' যেন আমি সত্যিই থাকতে তৈরি, এই মনে করে সে আশঙ্কিত হয়ে উঠতো। 'না, না। অসুবিধা আছে, থাকা যাবে না।' আমি মিছেমিছি জেদ করতাম, তখন সে আর কিছু বলতো না, বিছানা থেকে নেমে রুমের খুঁটিনাটি কিছু জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করত, যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদায়ের মুহূর্ত উৎপন্ন হতো; আমি আমার মোবাইল পকেটে রাখতাম, সিগারেটের প্যাকেটটা রাখতাম, রুমালটা; আস্তে আস্তে শার্টের বোতাম লাগাতাম; সে বলতো, 'কয়েকটা সিগারেট নিয়ে যাও।' আমার নিতে ইচ্ছা করতো না, তবু নিতাম; সে দরজা খুলে দিতো, আমি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখতাম, শীতের বিকাল ফুরিয়ে এসেছে, পথের উপর শুকনো পাতার বিষণ্নতা দেখতাম, আকাশের দিকে অবাক হয়ে তাকাতাম, চারপাশের গতিশীল পৃথিবীর মাঝে ঢুকতে আমার ভিতরে অনিচ্ছা জাগতো, কিন্তু মৃত ঝরা পাতারাও আমাকে কয়েক মুহূর্তের বেশি প্রশ্রয় দিতো না; আমি সি.এন.জি স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যেতাম।

Scanned with MOBILE SCANNER

নীল

নীল রয়েছে আকাশ কিংবা গাঢ় সমুদ্রে, নীল রয়েছে কখনো চোখের মণি তো কখনো প্রিয় ফুল নীলকণ্ঠে! আমাদের চারপাশে নীল এভাবেই তার নীলাম্বরী চাদর দিয়ে আমাদের জড়িয়ে রেখেছে। বাংলাদেশে নীল মানেই বেদনা। এই নীল বেদনার সাথে নীল বৃষ্টির একটা যোগ আছে যেটা কিনা প্রাচীন গ্রীক দেবতা জিউসের কল্প কাহিনির সাথে সম্পৃক্ত। দেবতা জিউস কাঁদলে বৃষ্টি নামতো, এমনটাই লেখা রয়েছে পুরাণে। তবে বিশ্বব্যাপী নীলের আবেদন আরো সুদূরপ্রসারী! বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এমনকি স্বর্গের আভাও প্রতিফলিত হয় এই নীল রঙে। রঙের মনস্তত্ত্ব ঘাঁটলে দেখা যায় নীল রঙ সর্বদা আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপত্তার বলয় তৈরি করতে পারে। নীল রঙকে তাই প্রশান্তি আর স্নিগ্ধতার 'ব্র্যান্ড এম্বাসেডর' বলা চলে। এই রঙ মানসিক ক্লান্তি কমায়, আশেপাশে এক ধরনের শান্ত আর শিথিল পরিবেশ তৈরি করে। নীল যতোটা ফ্যাকাশে হতে থাকে, আমাদের ক্লান্তি ততো পালাতে শুরু করে।

নীলকে পুরুষালী রঙ বলা হয়। বেশির ভাগ সমীক্ষাতে পুরুষেরা তাদের প্রিয় রঙ হিসেবে নীলকে বেছে নিয়েছে। গাঢ় নীল দৃঢ়তা আর স্থিরতার প্রতীক জন্যেই হয়তো! নীল আধ্যাত্মিকতা এবং নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাকারী রঙ; নীল সাহায্যকারী এবং নির্ভরতার রঙ। নীল সর্বদা আপনাকে দিয়েই যাবে, কখনো কেড়ে নেবে না কিছু। নীল সর্বদাই রক্ষণশীল আর আগে থেকেই আন্দাজ করা যায় এমন একটা রঙ। কাপড় থেকে শুরু করে ঘরের দেয়াল, নীল রঙের কাছে ধরা দেয়াটা তাই অনেকটাই নিরাপদ। তবে নীল একই সাথে হজম প্রক্রিয়া মন্থর করে দেয়, সেই অর্থে খাবার জিনিসে নীলের ব্যবহার এড়িয়ে চলাই মঙ্গল।

জিন্সের পুরোটা আভিজাত্য যেন নীল রঙেই মেলে। এশিয়াতে ইন্ডিগো আবিষ্কারের ইতিহাসটা বেশি পুরনো নয় যদিও। প্রাচীন প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রে এই রঙের অনুপস্থিতি দেখা যায়, এমনকি তখনকার কাপড় তৈরিতেও নীলের ব্যবহার একেবারেই যেন সীমিত। হয়তো উপযুক্ত নীল রঙ তৈরির উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতাই ছিল এর প্রধান কারণ। নীল রঙ পৃথিবীর অনেক এলাকাতেই, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাতে রক্ষাকারী রঙ হিসেবে পরা হয়ে থাকে। ঈশ্বরের চোখের রঙও কিনা নীল, সে রঙ তো তার অনুসারীদের রক্ষা করবেই। প্রাচীন মিশরীয় ঈশ্বর আমুন তার গায়ে নীল রঙ মেখে আকাশে উড়াল দিয়েছিল, যাতে আকাশের রঙের সাথে সে মিশে গিয়ে উড়তে পারে।

ফরাসীদের রাজা নবম লুইসকে নিয়মিত ত্রয়োদশ শতকে নীল রঙের কাপড় পরতে দেখা যেত। আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাথে নবম লুইসের কোনো মিল আছে কিনা ভেবে দেখতে পারেন! লুইসের প্রিয় রঙ হবার কারণেই হয়তো সেই শতক থেকেই ইউরোপের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রিয় পোষাকী রঙ হয়ে দাঁড়ায় নীল। ইউরোপীয় রেনেসাঁ এর সময় শিল্পীদের প্রিয় রঙে পরিণত হয় নীল। কুমারী ম্যারির প্রতি দর্শকদের চোখ ফেরাতে তাকে নীল রঙের কাপড় পরানো শুরু হয়। আমাদের অতি কাছের কৃষ্ণের গায়ের রঙটাও কিন্তু আসলে কালচে নীল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইউনিফর্ম-এর রঙ প্রায়ই নীল হতে দেখা যায়। প্রিয়তম মানুষের চোখের রঙ নীল ভাবতেই কেমন উত্তেজনা লাগে, তাই না? তবে নীল চোখের মণি হতে পারে নিষ্ঠুরতার প্রতীকও, 'সাইলেন্স অব দ্যা ল্যাম্বে' অ্যান্থনি হপকিন্সের চোখ দেখে সেই শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাওয়া শীতল অনুভব নীল ছাড়া সম্ভব?

৪৫০-৪৯০ ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্যের নীল রঙকে অনেকেই সমপ্রেমী পুরুষদের প্রতীকি রঙ বলেও গুলিয়ে ফেলেন। রঙের কোনো প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব নয়! একটা রঙ কেবল রঙের আবেদন নিয়েই আমাদের চক্ষু যুগলকে বিমুগ্ধ করুক। আকাশের আকাশী নীলে হারিয়ে গিয়ে লেখা হোক আরো কবিতা কিংবা তৈরি হোক আরও কিছু 'ব্লু ইজ দ্যা ওয়ার্মেস্ট কালার।' নীলের কাছে এর চেয়ে বেশি কি চাইবার আছে! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

অনু-কাব্য

মানুষের জীবনটাই যেন এক বিশাল প্রশ্ন। জীবনের মাঝবেলায় দাঁড়িয়ে আজ এটাই মনে হয়।

সেই কোন ছোট্টবেলা থেকেই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার শুরু। 'অনু, দুধ এখনও খাওনি কেন?' 'খেলনাটা ভাঙলে কিভাবে?' 'অনু, এতো পায়ে পায়ে ঘুরো কেন? 'তুমি কথায় কথায় এতো গাল ফুলাও কেন? তখন মনে হত কবে যে বড় হবো। তাহলে আর এতো প্রশ্ন শুনতে হবে না।

তারপর প্রশ্ন শুনতে শুনতেই কেটে গেল আরও সময়। প্রশ্নগুলো পালটে গেল। 'এতো রোদের মাঝে বাইরে গিয়েছ কেন?' 'সারাদিন খেলা, লেখাপড়া নেই?' 'অনু, আমাকে কাজে কর্মে একটু হেল্প করতে পারো না?'

প্রশ্নের সাথে তাল মিলিয়ে আমিও নিজেকে পাল্টাতে লাগলাম।

এলো কৈশোর। কতকিছু যে পাল্টে গেল। শরীরে-মনে কেমন সব অনুভূতি। নতুন, একেবারে নতুন। বুঝতে পারি না। কাউকে বলতে পারি না। নিজের মাঝেও এখন অসংখ্য প্রশ্ন। দু'একটার উত্তর হয়তো পাই বই বা পত্রিকা থেকে। কিন্তু তাতে ধোঁয়াশা কাটে না। চারপাশের প্রশ্নও পিছু ছাড়ে না। প্রশ্নগুলো পাল্টে যায়। যেমন, 'তুমি সারাদিন ঘরে থাকো কেন?' 'অনু, মাঠে একটু খেলতে যেতে পারো না?' 'এতো গল্পের বই পড়লে চলবে?'

আমি বলতে পারি না কিছু। কি বলবো। আমি তো বন্ধুদের সাথে মেলাতে পারি না নিজেকে। গরম আর ধুলোয় মেখে একটা বলের পিছনে ছোটা দেখলে আমার বিরক্ত লাগে। আমাকে হাতছানি দেয় ফেলুদা। বুকে কাঁপন লাগে ইন্দ্রনাথের কথা ভাবলে। মাসুদ রানার রহস্যময়তা চুম্বকের মতো টানে আমাকে। 'মৃত্যুক্ষুধা'র আনসারের বলিষ্ঠতায় মুগ্ধ হই। বন্ধুরা যখন স্কুলের বা মহল্লার মেয়েদের শরীর নিয়ে কথা বলে তখন আমার চোখ আটকে যায় আমার পাড়াতো বড় ভাইয়ের শার্টের খোলা বোতামের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়া লোমশ বুকে।

কৈশোর থেকে শুরু হওয়া সেই অনুভূতির প্রায় সবটাই বুঝে ফেলি তারুণ্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে। কিন্তু ততদিনে বদলে গেছে অনেক কিছু। নিজের সাথে বোঝাপড়া করে নেই। কিছু কিছু জায়গায় কোন প্রশ্নের ঠিক কি উত্তর দিবো তা ঠিক করে ফেলি। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র, যে-ই সেই প্রশ্ন করুক না কেন। আমার যতটুকু বলার ততটুকুই বলবো। চাপে পড়ে নিজের সিদ্ধান্ত বদলাবো না।

সেভাবেই চলছে জীবন। খুব সাদামাটা কিন্তু নিজের মতো। অনেক অপ্রাপ্তিই আছে কিন্তু তবু আছে সুখ। আমি কারো জন্য, কোনো অবস্থাতেই আমার সমপ্রেমী সত্ত্বাকে অপরাধ ভাবিনি। আড়াল করেছি, সমঝোতা করেছি, সবই সত্য। কিন্তু আর দশজনের কাছে নিজেকে বিষমপ্রেমী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজের বলে দেয়া পথে হাঁটিনি।

প্রশ্ন কিন্তু তবুও পিছু ছাড়েনি।

ছোটবেলায় ভাবতাম বড় হলে আর কেউ প্রশ্ন করবে না আমার জীবনযাপন নিয়ে। কিন্তু সে আশায় গুঁড়ে বালি! প্রশ্ন আসা থেমে থাকে না। চারপাশে থেকে তো বটেই, এমনকি নিজের কাছ থেকেও।

-এতো বয়স হল, বিয়ে করবে না?

-বিয়ে করছ না কেন?

-অনু, তোমার কি কোনো শারীরিক সমস্যা আছে?

এর উত্তর আমি জানি। কিন্তু উত্তর দেওয়া যায় না। তাইতো কৈশোর আর তারুণ্যের প্রিয় বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হয়। দূরে চলে যাই প্রিয় আত্মীয়দের কাছ থেকে। এড়িয়ে চলতে বাধ্য হই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো।

তবে উত্তরটা জানাতে পারি আমার আশেপাশের কিছু বন্ধুদের। আমি জানি আমি যা-ই হই না কেন, ওদের কাছে আমি শুধুই ওদের প্রিয় বন্ধু, কাছের মানুষ।

প্রশ্ন আসতেই থাকে।

-বিয়ে যে করলে না, শেষ বয়সে কে দেখবে তোমাকে?

-এখন না হয় শরীর শক্ত, নিজের সব নিজে করতে পারো, যখন বুড়ো হবে তখন কে দেখবে?

তাই তো! কে দেখবে?

কিন্তু শেষ বয়স পর্যন্ত আমি যদি বেঁচে না থাকি? বুড়ো বয়সের কয়েকটা বছরের কথা ভেবে আমি আমার কিংবা আরেকজনের জীবনে শঙ্কা তৈরি করবো? আমি তা চাই না। আসুক নিষ্ঠুর জরা। দেখি সেটার মোকাবেলা করতে পারি কি না। আমার ছোট মামা পাঁচ সন্তানের জনক। মরে পড়ে ছিলেন বাথরুমে। তবে? ভবিষ্যৎ কে জানে?

চারপাশের প্রশ্নকে তো তাও এড়ানো যায়। কিন্তু নিজের প্রশ্নকে? সব গোলমেলে থেকে যায়। আবছায়া ঘরে বিছানায় দুচোখে ঘুম আসে না। আমায় আমি প্রশ্ন করি, 'কোথায় সে জন?' উত্তর খুঁজে পাই না।

আমার ভালোবাসাতে কি ভুল ছিল? অথবা সে ভুল ছিল।

উত্তর খুঁজে পাই না।

তখন মনে পড়ে সমাজের-ধর্মের-রাষ্ট্রের প্রচলিত পথে হাঁটা দম্পতিদের কথা। কটা দম্পতি সুখে আছে? সমাজের কথা ভেবে, ধর্মের কথা ভেবে, সন্তানদের কথা ভেবে একে অন্যের প্রতি প্রবল ঘৃণা নিয়ে পাশাপাশি বসবাস করার চেয়ে একা থাকাই কি শ্রেয় নয়? আর আমাদের মত ভিন্ন ভালোবাসা যাদের, সেরকম কেউ যে একসাথে নেই তাতো না। হয়তো ভবিষ্যতের চাদরের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে আমার মানুষটিও। তবে? কিসের দ্বিধা?

তারুণ্যের শুরুতে যে সিধান্ত নিয়েছিলাম তা আজও সঠিক বলেই মনে করি। আমি আমার মতই ছিলাম, আছি, থাকবো। জীবনের মাঝবেলায় দাঁড়িয়ে সব অতৃপ্তি, যন্ত্রণা, সব নিঃসঙ্গতাকে মেনে নিয়েই আমার তৃপ্তি। সকল দুঃখের মাঝেই আমার সুখের বসবাস। কারোর কোন ক্ষতি না করে, যতটা পারা যায় নিজের মতো করে বেঁচে থাকাটাই যে সুখ! ■

Scanned with CamScanner

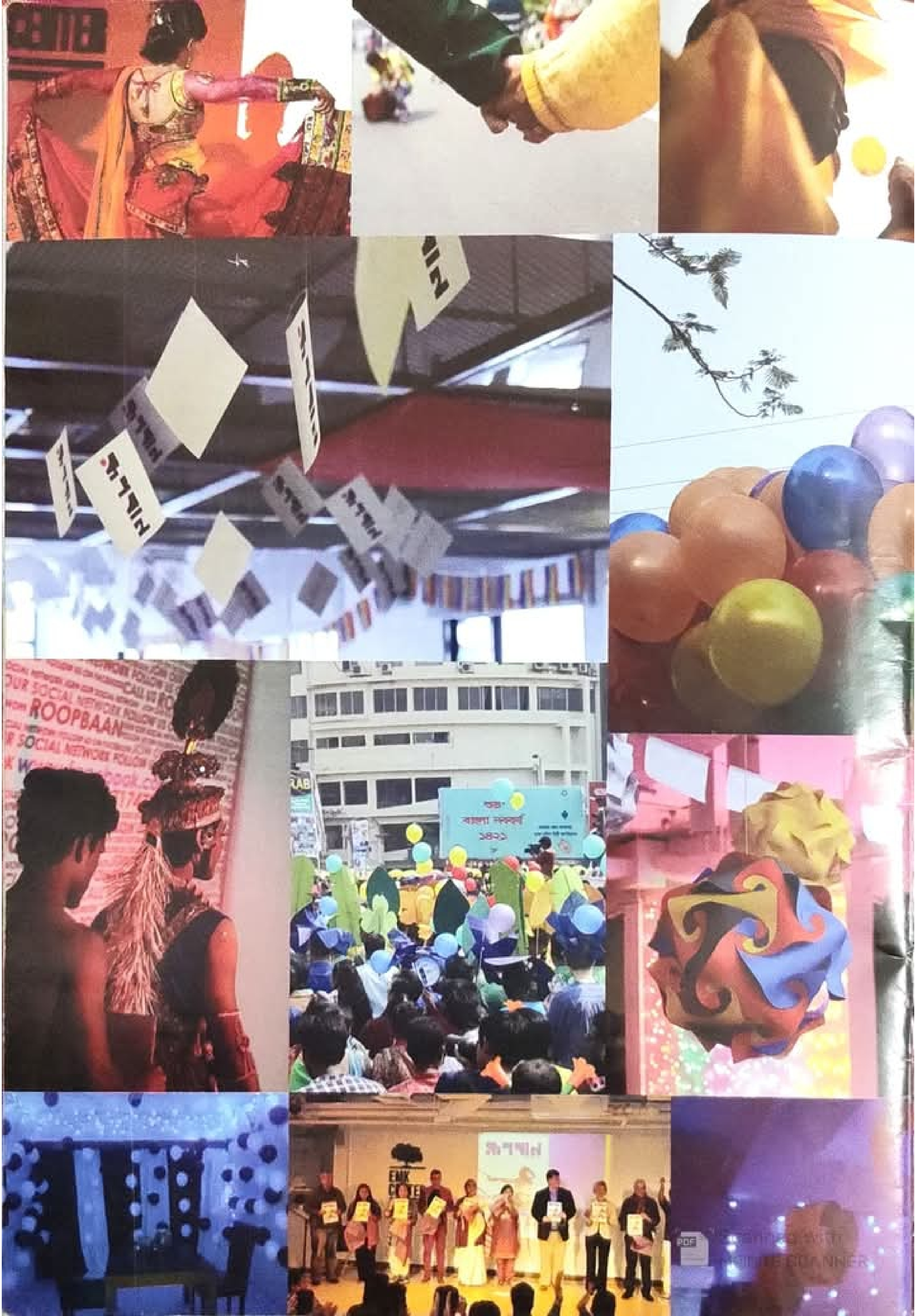
ROOPBAAN
EMK CENTER

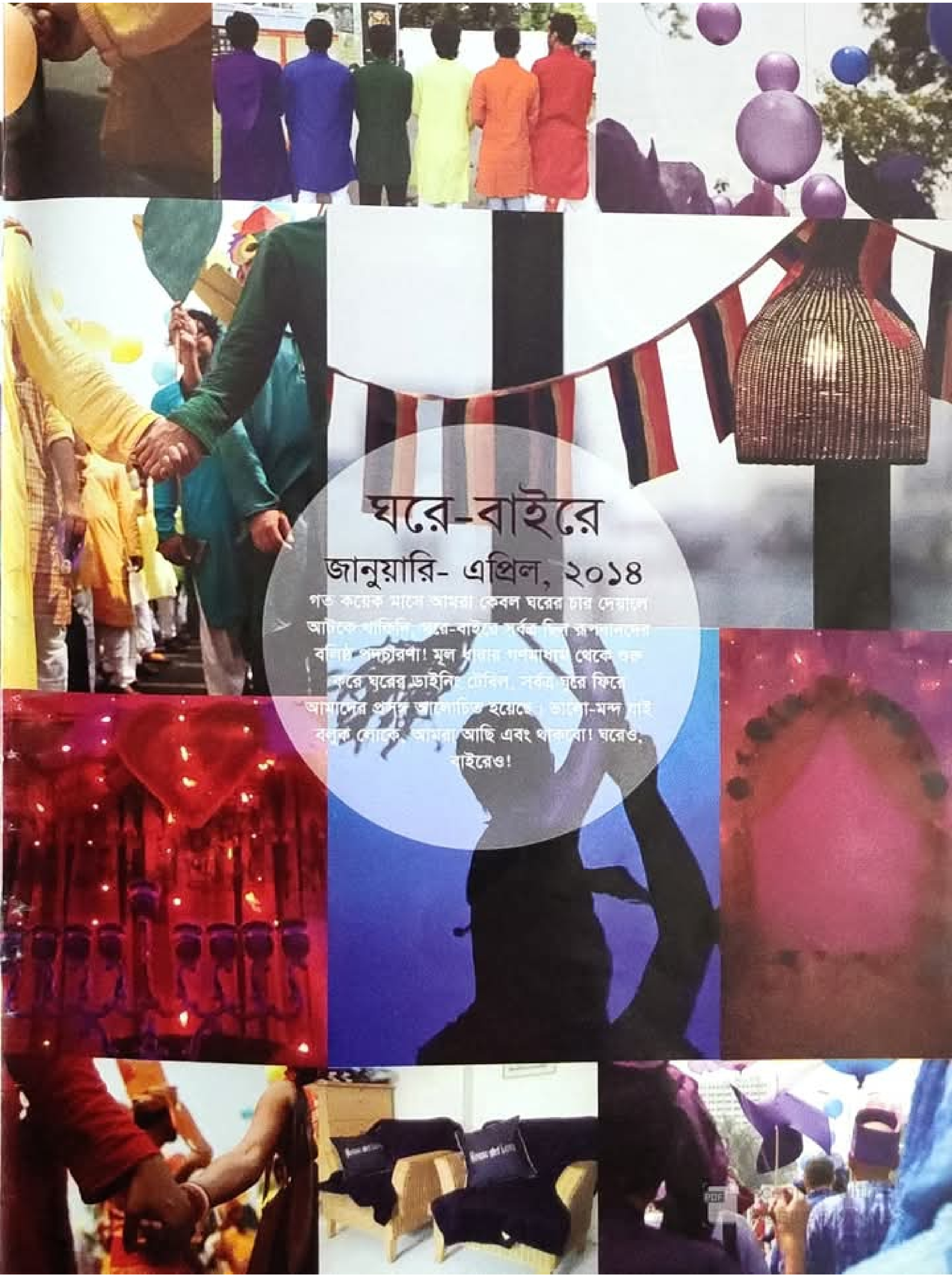

ঘরে-বাইরে

জানুয়ারি- এপ্রিল, ২০১৪

গত কয়েক মাসে আমরা কেবল ঘরের চার দেয়ালে আটকে থাকিনি, ঘরে-বাইরে সর্বত্র ছিল রূপবানদের বলিষ্ঠ পদচারণা! মূল ধারার গণমাধ্যম থেকে শুরু করে ঘরের ডাইনিং টেবিল, সর্বত্র ঘুরে ফিরে আমাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ভালো-মন্দ যাই বলুক লোকে, আমরা আছি এবং থাকবো! ঘরেও, বাইরেও!

টরাস

২১ এপ্রিল - ২১ মে

কোষ্ঠীনুযায়ী বৃষ রাশির জাতক হবেন শুভ্রবর্ণ, মাংশল ভরাট স্কন্ধ, পুরু ওষ্ঠ, সুন্দর চক্ষুদ্বয় এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশধারী। অনমনীয় দৃঢ়তা বৃষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও স্নেহ, প্রেম কিংবা কামের প্রতিও বৃষ কম লালায়িত নয়। কালপুরুষ মন্ডলের উত্তর-পশ্চিমে বৃষের অবস্থান। কালপুরুষের কোমর বন্ধনী উপররের দিকে বাড়িয়ে দিলে তা একটি বড় তারার পাশ দিয়ে যায়। এটিই বৃষ রাশির প্রথম তারা যার নাম আলফা-টরি। এর বাংলা নাম রোহিণী। রোহিণী নক্ষত্র এবং আলফা-টরি মিলে আকাশে ভি-আকৃতির নক্ষত্র তৈরি করে যা কিনা দেখতে অনেকটা ষাঁড়ের মুখের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোষ্ঠিনুযায়ী রোহিণী নক্ষত্রের প্রভাবেই বৃষের অন্তরে স্নেহ, প্রেম, মমতা এমনকি সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়।

অন্যান্য সব রাশির তুলনায় বৃষ রাশির জাতক-জাতিকা সর্বাধিক স্থিতিশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। এই কারণে এই রাশিকে অনেকে মাটি রাশিও বলে থাকেন। তবে সেটার খারাপ দিকও রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত একরোখা জেদ অনেক সময় অনেক সময় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারে। যেকোনো তত্ত্ব বা বিশ্বাসের প্রতি বৃষ একবার আস্থা আনলে সেটায় আঁঠার মতো লেগে থাকে এবং নিজের অবস্থান থেকে একচুল না নড়ে অন্যকে তার মতো করে ভাবতে বাধ্যও করাতে পারে।

বৃষ অন্য যেকোনো রাশির তুলনায় সর্বংসহা গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখি শৈশবে মায়ের মৃত্যু থেকে শুরু করে পিতা, প্রিয়তম স্ত্রী কিংবা সন্তানদের মৃত্যুভারও বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে মৃত্যুর আগ অবধি। অসংখ্য প্রিয় মানুষের মৃত্য কবিকে আচ্ছন্ন করলেও আক্রান্ত করেনি কোনোদিন। আমাদের দেশের জাহানারা ইমামের দিকে চোখ ফেরালে দেখতে পাই নিজ পুত্রকে দেশের জন্য যুদ্ধে পাঠাতে কিভাবে কাঠিন্যকে আলিঙ্গন করেছিলেন তিনি। মানসিক দুর্বলতা বৃষের জীবনে খুব একটা আরামদায়ক জায়গা কোনোদিন পায় না। বৃষ পুরুষ সাধারণত শান্ত, বুদ্ধিসম্পন্ন, সচেতন এবং সুস্থির হয়ে থাকে। যেকোনো ব্যাপারে ধীর-স্থির এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়াটা বৃষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। তবে আত্মকেন্দ্রিকতা একজন বৃষকে অন্যদের থেকে যথেষ্ট-ই আলাদা করে রাখতে পারে। তার নিরেট বৈষয়িক চিন্তা এই আত্মকেন্দ্রিকতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে।

বৃষ বাস্তববাদী। রাশিচক্রের দ্বিতীয় ঘর বৃষ, দ্বিতীয় ঘর ধনলাভের সূচক। এই রাশির জাতক তাই ধনহীন থাকেন না। তবে অর্থের সাথে সাথে খ্যাতির মোহ অনেকটাই বৃষের মজ্জাগত। খ্যাতি একজন বৃষের জীবনে প্রায়ই অবশ্যাম্ভাবী হিসেবে দেখা দেয়। ঈর্ষাপরায়ণতার দিক দিয়েও বৃষের জুড়ি মেলা ভার। অনেক সময় ঈর্ষাই বৃষকে অন্যান্যদের সাথে দলছাড়া করে ফেলতে পারে।

বৃষলগ্ন কিংবা সরাসরি বৃষ রাশির জাতককে অনেক সময় বাইরে থেকে চেনা মুশকিল হয়ে পড়ে। নিজের স্বার্থে অন্যের অনিষ্ট করতে অনেক সময়ই পিছু পা হন না বৃষ। কোনো কাজের ভার এসে পড়লে সেটা সমাধানের আগ পর্যন্ত বৃষের মনে শান্তি আসে না। মাত্রাতিরিক্ত কর্মাসক্তি অনেক সময়ই তার জীবনে অধঃপতনের কারণও হতে পারে। তবে বন্ধুযোগ এক্ষেত্রে বৃষের ভাগ্যে অন্যতম রাজযোটক হিসেবে জ্বলজ্বল করে। বিশ্বস্ত বন্ধু প্রাপ্তিতে বৃষের জুড়ি মেলা ভার। সৃজনশীলতার প্রতি বিশেষ আগ্রহের কারণে বৃষের আশেপাশেও অনেক সৃজনশীল মানুষের সমাগম লেগে থাকে।

প্রেমের ক্ষেত্রে বৃষ ভদ্র, নমনীয় এবং অনেকটাই রক্ষণশীল আচরণ করে থাকেন। বৃষের ভালোবাসায় কল্পনার বিলাসিতা থাকলেও বাড়াবাড়ি নেই, বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে বৃষ কেবল কল্পনার জাল বুনতে অপারগ। বৃষ স্বাধীনচেতা হলেও পুরনো রীতি-নীতি এর বাইরে গিয়ে নতুন কিছু সহজে ভাবতে চায় না। তবে আমাদের এতোকিছু বলার উদ্দেশ্য আদৌ এটা প্রমাণ করা নয় যে বৃষ প্রণয় সঙ্গী হিসেবে খারাপ। বৃষ যখন আপনাকে চাইবে, এতোটাই চাইবে যে সেই দৃঢ়তায় খড়কুটো হয়ে ভেসে যাবে যেকোনো মান-অভিমান, অনুযোগ কিংবা অবিশ্বাস। একজনকে ভালোবেসে তার প্রতিই আজীবন অনুগত থাকতে চায় বৃষ।

বৃষ জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হলেও হাল ছাড়েন না। কোনো না কোনো উপায় বের করা পর্যন্ত টিকে থাকেন, লেগে থাকেন শেষ অবধি। বৃষ রাশির কাছ থেকে পুরো মানব জাতির ধার করবার জন্য এই মনোভাবটাই যেন সর্বোত্তম।

দ্রষ্টব্যঃ রাশিচক্রের দুটো কাজের মধ্যে প্রথম কাজ ভাগ্য গণনাকে কাল্পনিক আত্মতৃপ্তি ভেবে নিলেও দ্বিতীয় ভাগে এটি সম-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন মানুষের চারিত্রিক নানা দিক নিয়ে নাড়াচাড়া করে। উল্লেখ্য যে প্রত্যেকটি মানুষই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তার উপর রাশিচক্রের প্রভাবের চাইতে জন্মোত্তর পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা এসবের বৈজ্ঞানিক প্রভাব অনেক বেশি। রাশিচক্রের উপরিউল্লিখিত তত্ত্বকথা তাই কোন রাশির জন্যই বেদবাক্য নয়!

ছবি: ইন্টারনেট

bob

boys of bangladesh

E-mail: info.bob.bd@gmail.com
Facebook: BoBangladesh.LGBT

“

অনেকদিন থেকেই বিষন্নতায় ভুগছিলাম, বন্ধুর অভাবে, মন খুলে কথা বলার অভাবে, নিজের কথাগুলো কাউকে বলতে না পারার কষ্টে। ফেসবুকে অনবরত বন্ধু খুঁজে যাচ্ছিলাম কথা বলার জন্য। দু-একজনের সাথে দেখা যে হয়নি তাও না, কিন্তু কিছু সময় গল্পের পর নিজের মানসিক অথবা সামগ্রিকতার সাথে তাল মেলাতে না পেরে আবার সেই বৃত্তের ভিতর ফিরে যাওয়া। আমি আমার ছাত্র জীবন থেকেই 'পার্ট টাইম জব' করতাম। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে গল্পে গল্পে এক 'কলিগ' বলল 'Boys of Bangladesh'- এর কথা। কি সেটা জানতে চাইলে সে চুপ করে গিয়েছিল। পরে বাসায় এসে সার্চ দিয়ে পেয়ে গেলাম 'Boys of Bangladesh'-এর পেজ। পেজ সম্পর্কে জেনে কিছুটা দ্বিধা নিয়েই পেজে লাইক দিলাম আর ফলো করা শুরু করলাম। এভাবে কেটে গেলো প্রায় এক বছর। শেষের দিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোতে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিলো, কিন্তু আমার আর তাদের সময় না মেলায় যাওয়া হয়ে উঠেনি। নারী স্বাধীনতা বিষয়ক একটা অনুষ্ঠানে তাদের বুথের জন্য কিছু পোস্টার তৈরি করবার দরকার ছিল, ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারিতে সাহস করে চলেই গেলাম। পরে একবার গেলাম আড্ডায়। মার্চ মাসে গেলাম তাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে। তারপর একটা ওয়ার্কশপে। এক ঝাঁক মানুষের সাথে দেখা হল। ধীরে ধীরে তাদের মাঝে মিশে যেতে থাকলাম। এখন আমি নিজের চিন্তাগুলো বলার মানুষ পেয়েছি। নিজের অতীত, কি চেয়েছিলাম, কি চাই এ-সবকিছুকে সাথে নিয়ে এখন আমি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারি। কিছু মানুষ এখন পাশে আছে যারা জীবনটাকে সহজভাবে দেখতে শিখিয়েছে। একথা বলতেই হয়, কিছু মানুষের এই প্রচেষ্টার কারণেই আজ আমি আমার মত করে বাঁচতে শিখেছি!

”

Scanned with MOBILE SCANNER

www.roopbaan.org
www.facebook.com/roopbaan
info@roopbaan.org
+88 01622562479